মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৩তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

জুলাই ২০১০

www.at-tahreek.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১৩তম বর্ষ	১০ম সংখ্যা
রজব- শা'বান	১৪৩১ হিঃ
আষাঢ়-শ্রাবণ	১৪১৭ বাং
জুলাই	২০১০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক

ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক

ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সহকারী সার্কুলেশন ম্যানেজার

মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন ও ফ্যাক্স: (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক, মোবাইল: ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ, মোবাইল: ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
ই-মেইল: tahreek@ymail.com
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোন: ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোন: ৯৫৬৮২৮৯

দেশে বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২৫০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১৩০/= টাকা।

● ॥ হাদিয়াঃ ১৬ টাকা মাত্র ॥ ●

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** — ০২

✡ **প্রবন্ধ :**

- ❑ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(২২তম কিস্তি)* — ০৪
  - মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- ❑ ইসলামে ভ্রাতৃত্ব — ১৫
  - ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ
- ❑ জুম'আর কতিপয় বিধান — ১৯
  -মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন
- ❑ পিতা-মাতার উপর সন্তানের অধিকার — ২৫
  -ড. মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
- ❑ শবেবরাত *-আত-তাহরীক ডেস্ক* — ২৯
- ❑ শবেবরাত : কতিপয় ভ্রান্ত ধারণার জবাব — ৩২
  -হাফেয হাবীবুল্লাহ আল-কাসেম

✡ **মনীষী চরিত :** — ৩৫

- ◆ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) *(২য় কিস্তি)*
  -নূরুল ইসলাম

✡ **কবিতা :** — ৩৯

- ◆ আঁধারে আলো
- ◆ একান্ত আকুতি
- ◆ অবাক লাগে

✡ **সোনামণিদের পাতা** — ৪০

✡ **স্বদেশ-বিদেশ** — ৪১

✡ **মুসলিম জাহান** — ৪৫

✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** — ৪৫

✡ **সংগঠন সংবাদ** — ৪৬

✡ **প্রশ্নোত্তর** — ৪৯

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী
সম্পাদকীয়
১৩ তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা জুলাই ২০১০

মে'রাজুন্নবী (ছাঃ)

মে'রাজ বলে পরিচিত ঐতিহাসিক ঘটনাটি দু'টি অংশে বিভক্ত। প্রথমে ইসরা এবং পরে মে'রাজ। 'ইসরা' অর্থ নৈশভ্রমণ এবং মি'রাজ অর্থ সিঁড়ি। শারঈ পরিভাষায় মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে ফিলিস্তীনের বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত বোরাকের সাহায্যে শেষরাতের স্বল্পকালীন নৈশভ্রমণকে 'ইসরা' বলা হয় এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদ থেকে ঊর্ধ্বগামী সিঁড়ির মাধ্যমে মহাকাশের সীমানা পেরিয়ে আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাতকে মি'রাজ বলা হয়। নবী জীবনে এটি ছিল একটি অলৌকিক ও শিক্ষাপ্রদ ঘটনা। পবিত্র কুরআনে সূরা বনু ইসরাঈলের ১ম আয়াতে 'ইসরা' এবং সূরা নজমের ১৩ থেকে ১৮ মোট ৬টি আয়াতে 'মি'রাজ' সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। পুরা ঘটনাটি ২৫ জন ছাহাবী বর্ণিত রাসূলের হাদীছসমূহে বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। যা অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও মুসলিম উম্মাহ্র নিকটে সর্বতোভাবে গৃহীত। তবে সূরা বনু ইসরাঈলের ১ম আয়াতেই ইসরা ও মি'রাজের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বিধৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'পরম পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রির একাংশে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্বছা পর্যন্ত, যার চতুস্পার্শ্বকে আমরা বরকতময় করেছি, যাতে আমরা তাকে আমাদের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা *(বনু ইসরাঈল ১৭/১)*। উক্ত আয়াতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রতীয়মান হয়। যেমন-

(১) ঘটনাটি ছিল অলৌকিক ও বিস্ময়কর। তাই আয়াতের শুরুতে 'সুবহানা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা বিস্ময়বোধক ক্ষেত্রেই কেবল ব্যবহৃত হয়। কেননা মক্কা থেকে ৪০ দিনের পথ চোখের পলকে যাওয়া ও আসার এ ঘটনায় মক্কার মুশরিক নেতারা বিস্মিত হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ এর দ্বারা আল্লাহ যে সবার উপরে ও একক স্রষ্টা এবং তিনি যে সকলপ্রকার শরীক হ'তে মুক্ত ও পবিত্র, সে কথা বুঝানো হয়েছে (২) ঘটনাটি ঘটেছিল রাতের একাংশের স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যে এবং যেটি রাসূল স্বেচ্ছায় করেননি বরং তাকে করানো হয়েছিল, যা 'আস্রা' ক্রিয়াপদ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। অতঃপর 'লায়লান' অনির্দিষ্ট বাচক শব্দ দ্বারা রাতের একাংশ বুঝানো হয়েছে, সারা রাত্রি নয়। আর সেটি ছিল শেষরাত্রিতে ফজরের পূর্বে যখন তিনি বোন উম্মে হানীর বাড়ীতে তাহাজ্জুদে ওঠেন ও মসজিদুল হারামে অবস্থান করছিলেন (৩) ইসরা ও মে'রাজ ছিল দৈহিক ও জাগ্রত অবস্থায়, স্বপ্নে ও ঘুমন্ত অবস্থায় নয়। যা *বে'আবদিহী* শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। দেহ এবং আত্মার সমন্বয়েই আব্দ হয়ে থাকে, পৃথকভাবে নয়। যেমন সূরা জিন ১৯ আয়াতে এবং সূরা আলাক্ব ১০ আয়াতে মক্কায় ছালাতরত রাসূলকে আব্দ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যদি এটা ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নের ব্যাপার হ'ত, তাহ'লে তাতে বিস্ময়ের কি ছিল? আর কেনইবা মি'রাজের ঘটনা শুনে অনেক নওমুসলিম মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল? অনেকে আয়েশা ও মু'আবিয়া (রাঃ)-কে দলীল হিসাবে পেশ করেন যে, তাঁরা স্বপ্নযোগে মে'রাজের সমর্থক ছিলেন। অথচ কথাটি ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। তাছাড়া মে'রাজের ঘটনার সময় আয়েশা ছিলেন মাত্র ৮ বছরের বালিকা। তখন তিনি রাসূলের ঘরে আসেননি। আর মু'আবিয়া তখন মুসলমান হননি (৪) রাত্রির শেষ প্রহরের নিরিবিলি ইবাদতের মাধ্যমেই আল্লাহকে পাওয়া যায়, সেদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে এঘটনার মধ্যে। (৫) 'ইসরা' অর্থাৎ নৈশভ্রমণটি ছিল মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্বছা পর্যন্ত। এখানে আল্লাহ উভয় স্থানের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন 'মসজিদ' হিসাবে, বায়তুল্লাহ হিসাবে নয়। কেননা বান্দার নিকট আল্লাহ্র প্রধান কাম্য হ'ল 'সিজদা'। আর সিজদা হ'ল উবূদিয়াত তথা আল্লাহ্র প্রতি দাসত্বের প্রধান নিদর্শন। দ্বিতীয় তাৎপর্য হ'ল, মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আক্বছাকে কেন্দ্র করেই তাওহীদের দাওয়াত সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে ইবরাহীমের জ্যেষ্ঠপুত্র ইসমাঈল ও তার বংশের মাধ্যমে মক্কা এবং কনিষ্ঠপুত্র ইসহাক ও তার বংশের মাধ্যমে কিন'আন তথা ফিলিস্তীন অঞ্চল হ'তে। তাওহীদের এই প্রধান দুই কেন্দ্রের উপর শেষনবীর অধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য রাসূলকে মাসজিদুল আক্বছা সফর করানো হয়।

(৬) 'আমরা (মসজিদুল আক্বছার) চতুস্পার্শ্বস্থ এলাকাকে বরকতমণ্ডিত করেছি' বাক্য দ্বারা উক্ত মসজিদের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। কেননা যেখানে চতুস্পার্শ্বস্থ এলাকাটি বরকতময়, সেখানে খোদ মসজিদটি নিঃসন্দেহে অনেকগুণ বেশী বরকতময়। অতঃপর চতুস্পার্শ্বস্থ বলার কারণ এই যে, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, আইয়ূব, ইউনুস, ইলিয়াস, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা সহ বড় বড় নবী ও রাসূলগণের কর্মস্থল ও অহি-র অবতরণ স্থল হ'ল এই অঞ্চলটি। কয়েক হাযার নবী কেবল এ অঞ্চলেই জন্ম ও মৃত্যুবরণ করেছেন। যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁদের নিকট থেকে তাওহীদের বাণী শুনেছে এবং ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়েছে। আর দুনিয়াবী বরকত এই যে, এ অঞ্চলটি আরব ভূখণ্ডের সবচেয়ে উর্বর ও শস্য-শ্যামল এলাকা। হাদীছে 'শাম' অঞ্চলের মর্যাদায় আরো অনেক বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

(৭) 'যাতে আমরা তাকে আমাদের নিদর্শন সমূহের কিছু অংশ দেখিয়ে দেই'- বাক্য দ্বারা ইসরা ও মি'রাজের মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। 'কিছু অংশ দেখিয়ে দেই' বলার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্র সকল নিদর্শন তাঁকে দেখানো হয়নি। বরং তার কিছু অংশ দেখানো হয়েছে। কি সেগুলো? হাদীছে যার ব্যাখ্যা এসেছে। যেমন (ক) সফরের পূর্বে তাঁর বক্ষ বিদারণ (খ) অতঃপর চোখের পলকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস গমন (গ) সেখানে মসজিদে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে জিব্রীলের সাথে ঊর্ধ্বারোহন (ঘ) অতঃপর সাত আসমানে নেতৃস্থানীয় নবীগণের সাক্ষাত লাভ (ঙ) এরপর জান্নাত, জাহান্নাম, মাক্বামে মাহমূদ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন (চ) অতঃপর সর্বোচ্চ সীমান্ত রেখা সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছে আল্লাহ্র সাথে কথোপকথন ও পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত লাভ (ছ) অতঃপর বায়তুল মুক্বাদ্দাস নেমে এসে সকল নবীর ছালাতে ইমামতি করণ (জ) অতঃপর বোরাক্ব বাহনে মক্কায় প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি।

মে'রাজের পুরো ঘটনাটিই তৎকালীন সময়ের হিসাবে ছিল মানবীয় জ্ঞানের বহির্ভূত। আর তার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল অকল্পনীয় দ্রুততার মধ্যে ঘটনাটি ঘটে যাওয়া। (৮) কিন্তু দেড় হাযার বছর পরে যখন মানুষ নিজেদের বানানো রকেটে চড়ে সশরীরে শব্দের চেয়ে দ্রুত গতিতে লক্ষ লক্ষ মাইল উপরে মহাশূন্যে চলে যাচ্ছে। চাঁদের পিঠে অবতরণ শেষে এখন সূর্যে পৌঁছবার স্বপ্ন দেখছে, তখন কি আর সেটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে? মানুষ যদি তার সীমিত বুদ্ধি ও ক্ষমতায় চাঁদে যেতে পারে, তাহ'লে মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ কি তাঁর বান্দাকে মহাশূন্য পেরিয়ে আরশের কাছে নিতে পারেন না? (৯) চোখের দৃষ্টি কত দ্রুত সূর্যের আলো দেখতে পায়! কানের শ্রবণশক্তি কত দ্রুত আকাশের গর্জন শুনতে পায়! শক্তিধর অদৃশ্য বস্তুসমূহের সামনে মানুষ কত অসহায়! অদৃশ্য ঝঞ্ঝাবায়ু দৃশ্যমান সবকিছুকে মুহূর্তের মধ্যে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। সাগর তলের অদৃশ্য সুনামির আঘাত ভূপৃষ্ঠকে চোখের পলকে তছনছ করে দেয়। (১০)

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী

সম্পাদকীয়

১৩ তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা জুলাই ২০১০

বায়ুমণ্ডলের সময়ের গতি এবং ইথার জগতের সময়ের গতি যে এক নয়, আজকের বিজ্ঞান তা প্রমাণ করে দিয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই দেড় হাযার বছর পূর্বে কুরআন বলেছে, 'তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্মপরিচালনা করেন। অতঃপর তা তাঁর নিকটে উর্ধ্বগামী হয় এমন দিনে যা তোমাদের গণনায় হাযার বছরের সমান' *(সাজদাহ ৫)*। অন্য আয়াতে এসেছে 'যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাযার বছর' *(মা'আরিজ ৪)*। অতএব ইসরা ও মে'রাজের দ্রুততা যদি মানুষের কল্পনা বহির্ভূত দ্রুততায় সম্পন্ন হয়, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কেননা (১১) ইতিপূর্বে নবী সুলায়মানের নির্দেশে চোখের পলকে রাণী বিলক্বীসের সিংহাসন উঠিয়ে আনার ঘটনা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে *(নমল ৪০)*। অনুরূপভাবে তিনি বায়ুর পিঠে সওয়ার হয়ে সকালে এক মাসের পথ ও বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করতেন *(সাবা ১২)*।

অবিশ্বাসীরা সন্দেহ করেছে বক্ষ বিদারণ ঘটনায়, মহাকাশে তাঁর দেহ পুড়ে ভস্মীভূত না হওয়ায়। (১২) অথচ আসমানী সফরের জন্য প্রস্তুত করে নেওয়ার স্বার্থেই বক্ষবিদারণ ঘটনা ঘটেছিল। আর আগুনে ভস্ম হওয়ার প্রশ্নই আসে না, যেখানে ফেরেশতা নিজেই তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বশীল। (১৩) আর এ অলৌকিক ঘটনা স্বয়ং আল্লাহ ঘটিয়েছেন এক মহান উদ্দেশ্যে, যা বুঝার ক্ষমতা দুর্বলচেতা মুসলমান বা অবিশ্বাসীদের নেই। আর তা হ'ল, (ক) জান্নাত-জাহান্নাম, আরশ-কুরসী সবকিছুর প্রত্যক্ষ দর্শন নবীর মনে এনে দেবে এক দৃঢ় প্রতীতি। যা তাকে নিশ্চিন্ত, প্রশান্ত ও আবেগমুক্ত করবে। ইতিপূর্বে আল্লাহ ইবরাহীমকে চারটি পাখির টুকরা সমূহ একত্রিত করে তাতে জীবন দিয়ে দেখিয়েছিলেন *(বাক্বারাহ ২৬০)*। মূসাকে তূর পাহাড়ে স্বীয় নূরের তাজাল্লী দেখিয়েছিলেন ও তার সাথে কথা বলেছিলেন *(আ'রাফ ১৪৩)*। কিন্তু আরশে নিজ সান্নিধ্যে ডেকে নিয়ে কোন মানুষের সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেননি বা সবকিছু দেখাননি। নিঃসন্দেহে নবুঅতে মুহাম্মাদীর সর্বোচ্চ মর্যাদা এখানেই (খ) এই প্রত্যক্ষ দর্শন তাকে ভবিষ্যৎ সমাজ সংস্কার ও সমাজ পরিচালনার দুরুহ কাজে নিশ্চিত পথ নির্দেশ দান করবে (গ) এই চাক্ষুস অভিজ্ঞতা তাকে ভবিষ্যৎ মাদানী জীবনের কঠিন পরীক্ষায়, যুদ্ধ-বিগ্রহে ও দুঃখ-কষ্টের বোঝা বহনে দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় অটল রাখবে (ঘ) এই অলৌকিক ঘটনা মানুষ অবিশ্বাস করবে জেনেও তিনি সত্য প্রকাশে দ্বিধা করেননি। যুগে যুগে সকল সত্যসেবীর প্রতি দ্ব্যর্থহীনভাবে সত্য প্রকাশের সে ইঙ্গিতই তিনি দিয়ে গেছেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলাম সত্যধর্ম। মানুষ তা গ্রহণ করুক বা না করুক এ সত্য চিরন্তন ও শাশ্বত। (ঙ) জানী দুশমন আবু জাহলের কাছে মে'রাজের ঘটনা নিজেই বর্ণনা করার মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে না। বরং স্বভাবধর্ম হওয়ার কারণেই তার নিজস্ব শক্তিতে তা প্রতিষ্ঠিত হবে। বিরোধীদের সকল বাধা মুকাবিলা করেই ইসলাম বিজয়ী হবে। দুর্বল বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসীদের তিনি কোনই গুরুত্ব দেননি। বরং আবুবকরের বিশ্বাস এতে আরও দৃঢ় হয়েছিল এবং তিনি নির্বিকারচিত্তে বলেছিলেন, আমি তাকে এর চাইতে অনেক বড় বিষয়ে সত্য বলে জানি। আমি সকালে ও সন্ধ্যায় তার নিকটে আগত আসমানী খবরকে সত্য বলে বিশ্বাস করে থাকি। আর এ দিন থেকেই তিনি 'ছিদ্দীক্ব' নামে অভিহিত হ'তে থাকেন' *(হাকেম ৩/৬২, ছহীহাহ হা/৩০৬)*।

(১৪) এই ঘটনায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সৃষ্টি ও স্রষ্টা, আবদ ও মা'বূদ কখনো এক নয়। উবূদিয়াত কখনো উলূহিয়াতের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে না। স্রষ্টা নিরাকার শূন্য সত্তা নন। তার নিজস্ব আকার আছে, যা কারু সাথে তুলনীয় নয়। (১৫) এটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সৃষ্টিসেরা মানুষের সবচেয়ে বড় গর্ব হ'ল তার 'আবদ' বা 'আল্লাহ্র দাস' হওয়া। সেজন্য প্রিয়তম মেহমান ও শ্রেষ্ঠতম রাসূলকে আল্লাহ 'আবদ' বলে প্রিয়ভাষণে অভিহিত করেছেন, 'রাসূল' বা 'মুহাম্মাদ' নামে নয়। (১৬) এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি তার বিশ্বাসে ও কর্মে সর্বদা আল্লাহ্র দাসত্ব করে, তাহ'লে সে সর্বোচ্চ মানবীয় মর্যাদায় আসীন হবে এবং আসমান ও যমীনের সর্বত্র সৃষ্টিজগতের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে *(বনু ইসরাঈল ৭০)*। আর যদি আল্লাহ্র দাসত্ব না করে, তাহ'লে সে শয়তানের দাসত্বে আবদ্ধ হবে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে অধঃপতনের অতলতলে নিক্ষিপ্ত হবে।

(১৭) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা'। অর্থাৎ মে'রাজের এই ঘটনায় আবু জাহল বাহিনী ও তাদের দোসররা কি বাজে মন্তব্য করল; পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ ও আবুবকর কি সুন্দর মন্তব্য করলেন সবই আল্লাহ শুনেছেন। অতঃপর বায়তুল মুক্বাদ্দাস সফরকারী অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সম্মুখে যখন রাসূলের বক্তব্যের পরীক্ষা নেওয়া হ'ল এবং তারা সবাই রাসূলের বক্তব্যের সাথে একমত হ'ল, অথচ তার উপরে ঈমান আনলো না, তাদের তখনকার বিবর্ণ ও হঠকারী চেহারা আল্লাহ দেখেছেন। যুগে যুগে অবিশ্বাসীদের অবস্থা এরকমই হবে। সাথে সাথে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় ও মযবূত হবে।

(১৮) পরিশেষে রাসূলকে দেওয়া হ'ল পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের তোহফায়ে মে'রাজ। আল্লাহ ইচ্ছা করলে জিব্রীলের মাধ্যমে দুনিয়াতেও ছালাতের এ নির্দেশ পাঠাতে পারতেন। কিন্তু আরশে নিজ সান্নিধ্যে ডেকে নিয়ে এই তোহফা প্রদানের মর্যাদা কত বেশী, তা যে কেউ বুঝতে পারেন। এর দ্বারা এই উপঢৌকনের মূল্য ও গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে, যা আমরা অনেকে বুঝতে পারি না। রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুর সময়ে উম্মতের উদ্দেশ্যে শেষ বাক্য বলে গেছেন ছালাত ও নারীজাতি সম্পর্কে। ক্বিয়ামতের দিন প্রথম প্রশ্ন হবে 'ছালাত' সম্পর্কে। ছালাত হ'ল আল্লাহকে স্মরণ করার ও তাঁর প্রতি দাসত্ব প্রকাশের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান। দৈনিক পাঁচবার মুসলমান আল্লাহ্র প্রতি দাসত্বের প্রতিজ্ঞা নেয় ও অন্তরজগতকে শয়তানী ধোঁকা থেকে মুক্ত করে। এর ফলে তার আত্মশুদ্ধি লাভ হয়। যা তার কর্মজগতে প্রতিফলিত হয় এবং এভাবে যাবতীয় শয়তানী কর্ম হ'তে ব্যক্তি ও সমাজ নিরাপদ থাকে। ছালাত তাই সত্যিকারের শান্তিময় মানবীয় সমাজ কায়েমের আবশ্যিক পূর্বশর্ত। ছালাতের বাইরে আত্মশুদ্ধি অর্জনের অন্য কোন নতুন তরীকা অবলম্বন করা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আতী কর্ম, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

(১৯) হিজরতের আগের বছরের যেকোন এক রাতে মে'রাজ সংঘটিত হয়। এর সঠিক দিন-তারিখ অস্পষ্ট রাখা হয়। যাতে মানুষ আনুষ্ঠানিকতায় বন্দী না হয় এবং মে'রাজের মূল তাৎপর্য বিস্মৃত না হয়। অথচ হতভাগা মুসলমানরা এখন অনুষ্ঠানের কফিন নিয়েই ব্যস্ত হয়েছে, মে'রাজের রূহ ভুলে গেছে। (২০) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম এদিনকে উপলক্ষ করে কোন দিবস পালন করেননি বা কোন বাড়তি ছালাত-ছিয়াম, যিকির, দান-ছাদাক্বা বা কোন অনুষ্ঠানাদি করেননি। অতএব ধর্মের নামে এসব করা বিদ'আত। এ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন! *(স.স.)*। *এই সাথে মে'রাজের উপর লেখকের দরসে হাদীছ পাঠ করুন সেপ্টেম্বর'০৪, ৭/১২ সংখ্যায়।-সম্পাদক।*

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২২তম কিস্তি)

হযরত মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

ভূমিকা :

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী লিখতে গিয়ে সবশেষে আমাদের প্রিয় নবী ও শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে লিখতে বসে ভাবছি কিভাবে লিখব। প্রাচীন নবীগণের জীবনী লিখতে গিয়ে কুরআনী তথ্যাবলীকে প্রধান উৎস ধরে নিয়ে সেই সাথে ক্ষেত্র বিশেষে বিশ্বস্ততম ইতিহাস ও তাফসীর গ্রন্থ সমূহের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কিন্তু শেষনবীর বেলায় তো বিশ্বস্ত উৎসের অভাব নেই। কুরআন ও হাদীছ ছাড়াও রয়েছে বিশ্বস্ত জীবনী গ্রন্থ সমূহ। যেখানে নবী জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন ভঙ্গীতে ও বিভিন্ন আঙ্গিকে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। ফলে কোন কোন জীবনীগ্রন্থ শত শত পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ‘মুখতাছার’ বা সংক্ষিপ্ত নাম দিয়ে যেসব নবী জীবনী আমাদের সম্মুখে রয়েছে, তার কোনটিই কয়েকশ’ পৃষ্ঠার কমে নয়। সর্বশেষ বিশ্বসেরা হিসাবে পুরস্কার প্রাপ্ত জীবনী ‘আর-রাহীকুল মাখতূম’ গ্রন্থটিও আরবীতে মধ্যম কলেবরের ৫১২ পৃষ্ঠার। যার বাংলা অনুবাদ (১ম সংস্করণ ১৯৯৫ইং) দু’খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩৮+৪১৯=৮৫৭।

বর্তমান ব্যস্ত জীবনে বড় বড় বই পড়ার সুযোগ খুব কম লোকেরই হয়। ফলে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আমরা অনেক শিক্ষিত লোকই আমাদের প্রাণপ্রিয় নবীর জীবনী সম্পর্কে জানি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবীগণের মধ্যে গত সিকি শতাব্দী অতিবাহিত করছি। এরপরেও দেশ-বিদেশে বহু সভা-সমিতি, সেমিনার-কনফারেন্সে যোগদান করে যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে, তা অতীব হতাশাব্যঞ্জক। প্রকাশ্য জনসভায় প্রশ্ন করেও দেখেছি, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আমরা অনেকে আমাদের প্রিয় নবীর এমনকি পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানীর নামটুকুও জানি না। তাঁর জন্ম কোথায় কোন বংশে, তাঁর মৃত্যু কোথায়, কবর কোথায় তাও অনেকে জানি না। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই মৎপ্রণীত ‘আরবী ক্বায়েদা’-র (১ম সংস্করণ ১৯৯৫) শেষদিকে মাত্র অর্ধ পৃষ্ঠার মধ্যে আমাদের নবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছি। যাতে কচি বাচ্চাদের হৃদয়পটে তাদের রাসূলের জীবন্ত ছবি অংকিত হয়ে যায়। কিন্তু এখন যেটা লিখব, এটার আঙ্গিক ও অবয়ব কেমন হবে, সে বিষয়ে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাচ্ছি যে, ‘মুখতাছার’ নামে প্রচলিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থগুলির চাইতেও মুখতাছার করব। তবে তা নিঃসন্দেহে হবে সঠিক তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ। সেই সঙ্গে প্রতি অধ্যায়ের শেষে থাকবে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর সমূহ। যাতে ব্যস্ত লোকেরা কেবল প্রশ্নোত্তর পড়েই অধিকাংশ কথা জানতে পারেন। আমার লেখনী হবে প্রতিবেদন মূলক এবং উপস্থাপনা হবে বক্তৃতার ভঙ্গিতে। যাতে ট্রেনে-বাসে-ষ্টীমারে বা বিমানে ভ্রমণকালে যাত্রীগণ বইটা সহজে পড়ে ফেলতে আকর্ষণ বোধ করেন। অন্যদিকে ছাত্ররাও সহজে বইটি আয়ত্ব করতে পারে এবং এ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আত্মস্থ করতে পারে।

বইটি রচনার ব্যাপারে ‘আর-রাহীক্ব’ মূল আরবী এবং ‘রাহমাতুল লিল ‘আলামীন’ মূল উর্দূ জীবনী গ্রন্থদ্বয়কে সামনে রেখে প্রয়োজন মত অন্যান্য সূত্রের সাহায্য নিয়েছি। উল্লেখ্য যে, আমাদের প্রিয় নবীকে আমরা মানুষ নবী হিসাবে পেশ করেছি, কথিত ‘নূরের নবী’ হিসাবে নয়। অতঃপর নবীজীবনী লেখার পিছনে আমাদের দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হ’ল শেষনবী (ছাঃ)-কে মানবতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত হিসাবে এবং ধর্ম ও কর্ম জীবনে সর্বযুগের সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে তুলে ধরা এবং পরকালীন উদ্দেশ্য হ’ল প্রিয় নবীর শাফা‘আত লাভ করা। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার শেষনবী (ছাঃ)-এর পদাংক অনুসরণের তাওফীক দাও। দীন লেখক ও তার পিতামাতাকে ক্ষমা কর এবং প্রাণপ্রিয় সন্তান-সন্ততি ও পরিবারবর্গকে তোমার রাস্তায় কবুল করে নাও- আমীন!

জীবনী শুরু

আরবের মরুদুলাল শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন ও মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। তাই আমরা প্রথমে আরবদেশ সম্পর্কে আলোকপাত করব।

আরবের অবস্থান স্থলঃ

মক্কাকে পৃথিবীর নাভিস্থল (وسط الأرض) বলা হয়। কুরআনে একে ‘উম্মুল ক্বোরা’ বা ‘আদি জনপদ’ বলা হয়েছে *(আন‘আম ৬/৯২; শূরা ৪২/৭)*। তিনদিকে সাগর বেষ্টিত প্রায় ১৩ লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী আরব উপদ্বীপ কেবল পৃথিবীর মধ্যস্থলেই অবস্থিত নয়, বরং এটি তখন ছিল চতুর্দিকের সহজ যোগাযোগস্থল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি। বর্তমান ফ্রান্সের প্রায় দ্বিগুণ এই বিশাল

ভূখণ্ডটির অধিকাংশ এলাকা মরুময়। অথচ এই ধূসর মরুর নীচে রয়েছে আল্লাহ্র রহমতের ফল্গুধারা বিশ্বের মূল্যবান তরল সোনার সর্বোচ্চ রিজার্ভ। এর পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে আরব উপসাগর, দক্ষিণে আরব সাগর (যা ভারত মহাসাগরের বিস্তৃত অংশ) এবং উত্তরে সিরিয়া ও ইরাকের ভূখণ্ড। পানিপথ ও স্থলপথে আরব উপদ্বীপ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ তিনটি মহাদেশের সাথে যুক্ত। আদি পিতা আদম, নূহ, ইদ্রীস, ছালেহ, ইবরাহীম, লূত্ব, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, শু'আয়েব, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, ইলিয়াস, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা *(আলাইহিমুস সালাম)* এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)* সহ সকল নবী ও রাসূলের আবির্ভাব ও কর্মস্থল ছিল এই পবিত্র ভূখণ্ড।

এর **প্রথম কারণ** ছিল অনুর্বর এলাকা হওয়ার কারণে পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার সঙ্গে আরবদের নিয়মিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ থাকায় এখানে নবুঅতের দাওয়াত দিলে তা সাথে সাথে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ত।

দ্বিতীয় কারণ: এই ভূখণ্ডে ছিল দুইটি পবিত্র স্থানের অবস্থিতি। প্রথমটি এবং সর্বশ্রেষ্ঠটি ছিল মক্কায় বায়তুল্লাহ বা কা'বা শরীফ। যা হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক প্রথম নির্মিত হয়। অতঃপর হযরত ইবরাহীম ও তৎপুত্র ইসমাঈলের হাতে পুনর্নির্মিত হয়। দ্বিতীয়টি ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস, যা কা'বা গৃহের চল্লিশ বছর পর আদম পুত্রগণের কারু হাতে প্রথম নির্মিত হয়। অতঃপর ইবরাহীমের পৌত্র ইয়াকূব বিন ইসহাক (আঃ) কর্তৃক নির্মিত হয়। অতঃপর দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক পুনর্নিমিত হয়। ইবরাহীম পুত্র ইসমাঈল-এর বংশধরগণ মক্কা এলাকা আবাদ করেন এবং বংশ পরম্পরায় তাঁরাই বায়তুল্লাহ্র রক্ষণাবেক্ষণ, হাজী ছাহেবদের জান-মালের হেফাযত, তাদের পানি সরবরাহ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন। অন্যদিকে ইবরাহীমের কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক (আঃ)-এর বংশধরগণ বায়তুল মুক্বাদ্দাস তথা আজকের ফিলিস্তীন এলাকায় বসবাস করেন। ইসহাকপুত্র ইয়াকূব (আঃ)-এর অপর নাম ছিল 'ইসরাঈল'। সেকারণ তাঁর বংশধর 'বনু ইসরাঈল' নামে খ্যাত। এভাবে আরব উপদ্বীপের দুই প্রধান এলাকা সহ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ইবরাহীমের বংশধর বনু ইসমাঈল ও বনু ইসরাঈল কর্তৃক তাওহীদের দাওয়াত প্রসার লাভ করে। সাথে সাথে তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوْحاً وَآلَ إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ- ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্বাচন করেছেন আদম ও নূহকে এবং ইবরাহীম পরিবার ও ইমরান পরিবারকে জগদ্বাসীর মধ্য হ'তে'। 'তারা একে অপরের সন্তান। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(আলে ইমরান ৩/৩৩-৩৪)*।

রাজনৈতিক অবস্থা:

এই সময় আরবের দক্ষিণাংশে ছিল হাবশার সাম্রাজ্য, পূর্বাংশে ছিল পারসিক সাম্রাজ্য এবং উত্তরাংশের ভূখণ্ড সমূহ ছিল রোমক সাম্রাজ্যের করতলগত। সম্রাট শাসিত এইসব অঞ্চলের অধিবাসীগণ সবাই ছিল ধর্মের দিক দিয়ে খৃষ্টান। যদিও প্রকৃত ধর্ম বলতে সেখানে কিছুই ছিল না। মক্কা ও ইয়াছবির (মদীনা) সহ আরবের বাকী ভূখণ্ডের লোকেরা স্বাধীন ছিল। তাদের কোন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না। তবে তারা গোত্রপতি শাসিত ছিল। তাদের মধ্যে দুঃসাহসিকতা ও বেপরোয়া ভাবটা ছিল তুলনামূলকভাবে বেশী। তাদের মধ্যে যেমন অসংখ্য দোষ-ক্রটি ছিল, তেমনি ছিল অনন্য সাধারণ গুণাবলী, যা অন্যত্র কদাচিৎ পাওয়া যেত। তাদের সৎসাহস, আমানতদারী, সত্যবাদিতা, কাব্য প্রতিভা, স্মৃতিশক্তি, অতিথিপরায়ণতা ছিল কিংবদন্তীতুল্য। বছরে চার মাস তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। মক্কার লোকেরা ইহুদী বা খৃষ্টান ছিল না। তারা নিজেদেরকে ইবরাহীম (আঃ)-এর একান্ত অনুসারী হিসাবে 'হানীফ' (একনিষ্ঠ একত্ববাদী) বলত। মক্কা ছিল সমগ্র আরব ভূখণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু এবং সম্মান ও মর্যাদায় শীর্ষস্থানীয়। সেকারণ খৃষ্টান রাজারা এর উপরে দখল কায়েম করার জন্য বারবার চেষ্টা করত। এক সময় ইয়ামনের নরপতি আবরাহা নিজ রাজধানীতে স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে কা'বা গৃহের আদলে একটি সুন্দর গৃহ নির্মাণ করেন এবং সবাইকে সেখানে হজ্জ করার নির্দেশ জারি করেন। কিন্তু জনগণ তাতে সাড়া দেয়নি। বরং কে একজন গিয়ে তার ঐ নকল কা'বা গৃহে (?) পায়খানা করে আসে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সে প্রায় ৬০,০০০ সৈন্য ও হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান করে কা'বা গৃহকে ধ্বংস করার জন্য। অবশেষে আল্লাহ্র গযবে তিনি নিজে তার সৈন্যসামন্ত সহ ধ্বংস হয়ে যান। এতে মক্কার সম্মান ও মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায় এবং এ ঘটনা বণিকদের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্মের মাত্র ৫০ বা ৫৫ দিন পূর্বে এই অলৌকিক ঘটনা ঘটে। বস্তুতঃ এটা ছিল শেষনবীর আগমনের আগাম শুভ সংকেত।

সমগ্র আরব ভূখণ্ডে মক্কার ব্যবসায়ীদের মর্যাদা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। তারা শীতকালে ইয়ামনে ও গ্রীষ্মকালে শাম বা সিরিয়ায় ব্যবসার জন্য যাতায়াত করত। কিন্তু এই দীর্ঘ সফরে কখনো তাদের কাফেলা লুট হ'ত না। হারম

শরীফের মর্যাদার কারণে তাদের মর্যাদা আপামর জনগণের মধ্যে এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে, চোর-ডাকাতেরাও তাদেরকে সমীহ করত। এটাই যেখানে বাস্তবতা, সেখানে তাদেরকে 'জাহেলী আরব' কেন বলা হয়? এর কারণ সম্ভবতঃ এটাই ছিল যে, তারা ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসারী হবার দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র বিধান সমূহকে অগ্রাহ্য করেছিল এবং খোদ আল্লাহ্‌র ঘরেই মূর্তি পূজা শুরু করেছিল। তারা শেষনবীকে চিনতে পেরেও তাঁকে অস্বীকার করেছিল। নিঃসন্দেহে এটা ছিল সবচেয়ে বড় জাহেলিয়াত ও সবচেয়ে বড় মূর্খতা। আর একারণেই তো 'জ্ঞানের পিতা' আবুল হেকাম-কে 'মূর্খতার পিতা' আবু জাহল লকব দেওয়া হ'ল। এক্ষণে আমরা মক্কায় শিরক প্রসারের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করব।-

মক্কার ধর্মীয় অবস্থা : শিরকের প্রচলন

মক্কার লোকেরা মূলতঃ হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর ছিল এবং তারা জন্মগতভাবেই তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসী ছিল। তারা কা'বা গৃহকে যথার্থভাবেই আল্লাহ্‌র গৃহ বা বায়তুল্লাহ বলে বিশ্বাস করত এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করত। তারা এখানে নিয়মিতভাবে ত্বাওয়াফ, সাঈ ও হজ্জ করত এবং বহিরাগত হাজীদের নিরাপত্তা ও পানি সরবরাহের দায়িত্ব পালন করত। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ কোন নবী না আসায় শয়তানী প্ররোচনায় তাদের সমাজনেতা ও ধনিক শ্রেণীর অনেকে পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং এক সময় তাদের মাধ্যমেই মূর্তি পূজার শিরকের সূচনা হয়, যেভাবে ইতিপূর্বে নূহের সমাজে হয়েছিল।

(১) কুরায়েশ বংশের বনু খোযা'আহ গোত্রের সরদার আমর বিন লুহাই (عمرو بن لحى) অত্যন্ত ধার্মিক, দানশীল ও দরবেশ স্বভাবের লোক ছিলেন। লোকেরা তাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত এবং তার প্রতি অন্ধভক্তি পোষণ করত। তাকে আরবের শ্রেষ্ঠ আলেম ও অলি-আউলিয়াদের মধ্যে গণ্য করা হ'ত। অতএব শয়তান তাকেই বেছে নিল তার কার্যসিদ্ধির জন্য। একবার তিনি শামে গিয়ে দেখেন যে, সেখানকার লোকেরা জমকালো আয়োজনের সাথে 'হোবল' (هبل) নামক মূর্তির পূজা করে। এর অসীলায় তারা বৃষ্টি প্রার্থনা করে। আমর ভাবলো অসংখ্য নবী-রাসূলের জন্ম ও কর্মভূমি এই শামের ধার্মিক লোকেরা যখন হোবল মূর্তির অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করে, তখন আমরাও এটা করলে উপকৃত হব। ফলে বহু মূল্যের বিনিময়ে আমর একটা হোবল মূর্তি খরিদ করে নিয়ে গেল এবং মক্কার নেতাদের রাযী করিয়ে কা'বাগৃহে স্থাপন করল। কথিত আছে যে, একটা জিন আমরের অনুগত ছিল। (২) সেই-ই তাকে খবর দেয় যে, নূহ (আঃ)-এর সময়কার বিখ্যাত অদ, সুওয়া' ইয়াগূছ, ইয়াঊক্ব, নাসর *(নূহ ৭১/২৩)* প্রতিমাগুলি জেদ্দার অমুক স্থানে মাটিতে প্রোথিত আছে। আমর সেখানে গিয়ে সেগুলো উঠিয়ে এনে তেহামায় রেখে দিল। অতঃপর হজ্জ-এর মওসুমে সেগুলিকে বিভিন্ন গোত্রের হাতে সোপর্দ করে দিল। এসব মূর্তি ছাড়াও আরবের প্রাচীনতম মূর্তি ছিল লোহিত সাগরের নিকটবর্তী 'মুসাল্লাল' নামক স্থানের 'মানাত' (مناة), ত্বায়েফের 'লাত' (لات) এবং নাখলা উপত্যকার 'ওয্যা' (عزى) সবচাইতে প্রসিদ্ধ।

এভাবে আস্তে আস্তে আরবের ঘরে ঘরে মূর্তির প্রচলন ঘটে। ফলে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বা গৃহে ৩৬০টি মূর্তি দেখতে পান এবং সবগুলোকে বের করে এনে ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেন ও কা'বা গৃহ পানি দিয়ে ধুয়ে ছাফ করে ফেলেন।

বিদ'আতের প্রচলন :

মূর্তিপূজা করা সত্ত্বেও তারা ধারণা করত যে, তারা দ্বীনে ইবরাহীমের উপরে দৃঢ়ভাবে কায়েম আছে। কেননা আমর বিন লুহাই তাদের বুঝিয়েছিল যে, এগুলি ইবরাহীমী দ্বীনের বিকৃতি নয়, বরং 'বিদ'আতে হাসানাহ'। অর্থাৎ ভালো কিছুর সংযোজন মাত্র। এজন্য সে বেশকিছু ধর্মীয় রীতি-পদ্ধতি আবিষ্কার ও চালু করেছিল। যেমন- (১) তারা মূর্তির পাশে বসে তাকে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করত ও তাদের অভাব মোচনের জন্য অনুনয়-বিনয় করে প্রার্থনা জানাতো। তারা ধারণা করত যে, এই মূর্তি তাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যশীল করবে *(যুমার ৩৯/৩)* এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে সুফারিশ করবে *(ইউনুস ১০/১৮)*।

(২) তারা মূর্তির উদ্দেশ্যে হজ্জ করত, ত্বাওয়াফ করত, তার সামনে প্রণত হ'ত ও সিজদা করত। (৩) তারা মূর্তির জন্য নযর-নেয়ায নিয়ে আসত। সেখানে মূর্তির নামে কুরবানী করত *(মায়েদাহ ৫/৩)*। (৪) তারা মূর্তিকে খুশী করার জন্য গবাদি পশু ও তাদের জন্য চারণক্ষেত্র মানত করত। যাদেরকে কেউ ব্যবহার করতে পারত না *(আন'আম ৬/১৩৮-১৪০)*। (৫) তারা তাদের বিভিন্ন কাজের ভাল-মন্দ ফলাফল ও ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন প্রকারের তীর ব্যবহার করত। যাতে হ্যাঁ, না, ভাল, মন্দ ইত্যাদি লেখা থাকত। হোবল দেবতার খাদেম সেগুলো একটি পাত্রের মধ্যে ফেলে অতঃপর তাতে ঝাঁকুনি দিয়ে তীরগুলি ঘুলিয়ে ফেলত। অতঃপর যে তীরটা বেরিয়ে আসত, সেটাকেই তারা ভাগ্য মনে করত এবং সে অনুযায়ী কাজ করত। (৬)

www.at-tahreek.com

এতদ্ব্যতীত তারা জ্যোতিষীদের কথার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করত এবং বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রকে মঙ্গলামঙ্গলের কারণ মনে করত। (৭) তারা পাখি উড়িয়ে দিয়ে কাজের শুভাশুভ ও ভাল-মন্দ নির্ধারণ করত।

দ্বীনে ইবরাহীমীতে উপরোক্ত শিরক ও বিদ'আত সমূহ চালু করার পরেও তাদের অহংকার ছিল এই যে, (১) আমরা ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনে হানীফ-এর খাঁটি অনুসারী। তাঁরা কা'বা গৃহের সংরক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক। অতএব তাদের সমকক্ষ আরব ভূখণ্ডে কেউ নেই। তাদের এই বড়ত্বের ও আভিজাত্যের অহংকার এতদূর পৌঁছে গিয়েছিল যে, তারা যেহেতু 'হুম্স' (حُمْس) অর্থাৎ 'সবচেয়ে বড় বীর ও বড় ধার্মিক' অতএব তাদের পক্ষে 'হারাম'-এর সীমানার বাইরে কোন 'হালাল' এলাকায় যাওয়াটা মর্যাদাকর নয়। তারা যেহেতু 'ক্বাত্বীন' (قطين) বা 'আহ্লুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ্র ঘরের বাসিন্দা, সেকারণ তারা হজ্জের মওসুমে 'মুযদালিফায়' অবস্থান করত, যা ছিল হারাম এলাকার অভ্যন্তরে। হারামের বাইরে হওয়ার কারণে তারা আরাফাতের ময়দানে যেত না বা সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসা অর্থাৎ ত্বাওয়াফে এফাযাহ করত না। যা ছিল হজ্জের সবচেয়ে বড় রুকন। তারা মুযদালেফায় অবস্থান করত ও সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসত। সেজন্য আল্লাহ নির্দেশ দেন, ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ 'অতঃপর তোমরা ঐ স্থান থেকে ফিরে এসো ত্বাওয়াফের জন্য, যেখান থেকে লোকেরা ফিরে আসে (অর্থাৎ আরাফাত থেকে) *(বাক্বারাহ ২/১৯৯)*।

(২) এতদ্ব্যতীত তারা নিজেরা ধর্মীয় বিধান রচনা করেছিল যে, বহিরাগত হাজীগণ মক্কায় এসে প্রথম ত্বাওয়াফের সময় তাদের পরিবেশিত ধর্মীয় কাপড় (ثياب الحُمْس) পরিধান করবে। সম্ভবতঃ এটা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থদুষ্ট বিদ'আত ছিল। যদি কেউ (আর্থিক কারণে বা অন্য কারণে) তা সংগ্রহে ব্যর্থ হয়, তবে পুরুষেরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে এবং মেয়েরা সব কাপড় খুলে রেখে কেবল ছোট্ট একটা কাপড় পরে ত্বাওয়াফ করবে। এতে তাদের দেহ একপ্রকার নগ্নই থাকত। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ 'হে বনু আদম! প্রতিবার মসজিদে উপস্থিত হবার সময় তোমাদের পোষাক পরিধান কর' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। তাদের কাছ থেকে 'হুম্স' কাপড় কিনতে বাধ্য করার জন্য তারা এ বিধানও করেছিল যে, যদি বহিরাগত কেউ উত্তম পোষাকে এসে ত্বাওয়াফ করে, তাহ'লে ত্বাওয়াফ শেষে তাদের ঐ পোষাক খুলে রেখে যেতে হবে। যার দ্বারা কেউ উপকৃত হ'ত না। (৩) তাদের বানানো আরেকটা বিদ'আতী রীতি ছিল এই যে, তারা এহরাম পরিহিত অবস্থায় স্ব স্ব বাড়ীর সম্মুখ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। কিন্তু বাকী আরবরা সকলে স্ব স্ব বাড়ীর পিছন দিকের সরু পথ দিয়ে গৃহে প্রবেশ করবে। সম্মুখ দরজা দিয়ে নয়। এভাবে তারা তাদের ধার্মিকতার ক্ষেত্রে বৈষম্যগত শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব সারা আরবের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا 'আর পিছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। বরং মঙ্গল রয়েছে আল্লাহকে ভয় করার মধ্যে। তোমরা ঘরে প্রবেশ কর সম্মুখ দরজা দিয়ে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৯)*।

উপরোক্ত আলোচনায় তৎকালীন আরবের ও বিশেষ করে মক্কাবাসীদের মধ্যে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আত সমূহের একটা চিত্র পাওয়া গেল। যা তারা ইবরাহীমের একত্ববাদী দ্বীনে হানীফের মধ্যে ধর্মের নামে তারা চালু করেছিল।

ইয়াছরিবের ইহুদী-নাছারাদের অবস্থা :

অপর পক্ষে যারা ইহুদী-নাছারা ছিল, যারা প্রধানতঃ ইয়াছরিবে (মদীনায়) বসবাস করত, যারা অত্যাচারী রাজা বখত নছর কর্তৃক কেন'আন (ফিলিস্তীন) থেকে উৎখাত হওয়ার পরে ইয়াছরিবে এসে বসবাস শুরু করেছিল এই উদ্দেশ্যে যে, তারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস হারিয়েছে। অতএব তারা এখন বায়তুল্লাহ্র নিকটবর্তী থাকবে এবং নিয়মিত হজ্জ-ওমরাহর মাধ্যমে পরকালীন পাথেয় হাছিল করবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল যে, আখেরী নবীর আবির্ভাব যেহেতু মক্কায় হবে এবং তার আবির্ভাবের সময় আসন্ন, অতএব তারা দ্রুত তার দ্বীন কবুল করবে এবং তার নেতৃত্বে আবার বায়তুল মুক্বাদ্দাস দখল করবে। তবে তাদের ধারণা ছিল এই যে, আখেরী নবী অবশ্যই তাদের বংশ থেকেই হবেন। কিন্তু তা না হওয়াতেই হ'ল যত বিপত্তি। তাদের মধ্যে তাওরাত-ইঞ্জীলের কোন শিক্ষা অবশিষ্ট ছিল না। তাদের ধর্ম ও সমাজ নেতারা (الأحبار والرهبان) ভক্তদের কাছে 'রব'-এর আসন দখল করেছিল। ইহুদীরা ওযায়েরকে আল্লাহ্র বেটা বানিয়েছিল এবং নাছারারা মসীহ ঈসাকে একইভাবে দাবী করেছিল *(তওবাহ ৯/৩০-৩১)*। বরং তারা মারিয়াম, ঈসা ও আল্লাহকে নিয়ে তিন উপাস্যের সমন্বয়ে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল *(মায়েদাহ ৫/৭৩)*। তাদের পীর-দরবেশরা বাতিল পন্থায় ধর্মের নামে মানুষের অর্থ-

www.at-tahreek.com

সম্পদ লুট করত এবং তাদেরকে আল্লাহ্র পথ হতে ফিরিয়ে রাখতো *(তওবাহ ৯/৩৪)*। আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তারা তা হারাম করত না *(তওবাহ ৯/২৯)*। এক কথায় তাওরাত-ইঞ্জীলের বাহক হবার দাবীদার হ'লেও তারা ছিল পূরা স্বেচ্ছাচারী দুনিয়াদার।

আরবের সামাজিক অবস্থা :

(ক) **নারীদের অবস্থা :** তৎকালীন আরবে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন বসবাস করত। সেখানকার অভিজাত শ্রেণীর লোকদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে খুবই উন্নত ছিল। পুরুষ প্রধান সমাজ ব্যবস্থা থাকলেও নারীদের ছিল মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। পরিবারে পুরুষ ও মহিলাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল মর্যাদা ও ন্যায় ভিত্তিক ব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত। বহু ব্যাপারে মহিলাদের স্বাধীনতা দেওয়া হ'ত। তাদের যুক্তি সংগত কথাবার্তার যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হ'ত। অভিজাত পরিবারের মহিলাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের মান-সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হ'ত। তাদের মর্যাদা হানিকর কোন অবস্থার উদ্ভব ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তরবারি কোষমুক্ত হয়ে যেত। মহিলাদের মর্যাদা এতই উঁচুতে ছিল যে, বিবদমান গোত্রগুলিকে একত্রিত করে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনেও তারা সক্ষম হ'ত। পক্ষান্তরে তাদের উত্তেজিত বক্তব্যে ও কাব্য গাথায় যেকোন সময় দুই গোত্রে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারত। ওহোদের যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তার সাথী মহিলাদের নিয়ে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে একাজটিই করেছিল। তাদের মধ্যে বিবাহ পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের। উভয় পক্ষের অভিভাবকগণের সম্মতি ও কনের স্বীকৃতি লাভের পর বর কনেকে নির্ধারিত মোহরানার বিনিময়ে বিয়ে করতে পারত। বিয়েতে ও সন্তানের আক্বীক্বাতে সমাজ নেতাদের দাওয়াত করে ধুমধামের সাথে অনুষ্ঠান করা তাদের সামাজিক রেওয়াজ ছিল।

অপর পক্ষে সাধারণ ও দরিদ্র শ্রেণীর আরবদের মধ্যে ছিল এর বিপরীত চিত্র। তাদের মধ্যে চার ধরনের বিবাহ চালু ছিল। এক ধরনের ছিল অভিজাত শ্রেণীর মত পারস্পরিক সম্মতি ও মোহরানার বিনিময়ে বিবাহ পদ্ধতি। কিন্তু বাকী তিনটি পদ্ধতিকে বিবাহ না বলে স্পষ্ট ব্যভিচার বলা উচিত। যা ভারতীয় হিন্দু সমাজে রাক্ষস বিবাহ, গান্ধর্ব্য বিবাহ ইত্যাদি নামে আধুনিক যুগেও চালু আছে বলে জানা যায়। আরবীয় সমাজে স্বাধীনা ও দাসী দু'ধরনের নারীর অস্তিত্ব ছিল। দাসীদের অবস্থা ছিল মানবেতর। তারা বাজার–ঘাটে বিক্রয় হ'ত। মনিবের মনোরঞ্জনই ছিল তাদের প্রধান কাজ। স্বাধীনাগণ সমাজে সম্মানিতা হিসাবে গণ্য হতেন।

(খ) **গোত্রীয় সমাজ ব্যবস্থা :** আরবদের সামাজিক ব্যবস্থা গোত্র প্রধান হওয়ার কারণে বংশীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্ককে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হ'ত। মারামারি ও হানাহানিতে জর্জরিত উক্ত সমাজে কেবল গোত্রীয় ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনের উপরে নির্ভর করেই তাদের টিকে থাকতে হ'ত। ন্যায়-অন্যায় সবকিছু নির্ণীত হ'ত গোত্রীয় স্বার্থের নিরিখে। আজকালকের কথিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থায় যে উৎকট দলতন্ত্র আমরা লক্ষ্য করছি, তা জাহেলী আরবের গোত্রীয় সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে অনেকটা তুলনীয়। বরং তাদের চাইতে নিম্নতর অবস্থার দিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি। কেননা তখনকার যুগের ক্ষয়-ক্ষতির চাইতে আজকের যান্ত্রিক যুগের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অকল্পনীয়ভাবে বেশী। গোত্র সমূহের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। সেকারণ তারা অধিক সংখ্যায় পুত্র সন্তান কামনা করত। অধিক সংখ্যক ভাই ও পুত্র সন্তানের মালিককে সবাই সমীহ করত। যুদ্ধে পরাজিত হ'লে নারীদের বেইযযতি ও তাদের লুট করে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে অথবা দরিদ্রতার কারণে অনেকে কন্যা সন্তানকে শিশুকালেই হত্যা করে ফেলত। তাদের কোন গোত্রীয় আর্থিক রিজার্ভ ছিল না। যুদ্ধ শুরু হ'লে সবাই প্রয়োজনীয় ফাণ্ড গোত্র নেতার কাছে জমা করত ও তা দিয়ে যুদ্ধের খরচ মেটাত। তবে পূর্ব থেকে ধর্মীয় রীতি চলে আসার কারণে তারা বছরে চারটি সম্মানিত মাসে (যুল-ক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ, মুহাররম ও রজব) যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখতো। এটা ছিল তাদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মীয় রক্ষাকবচ। গোত্রনেতারা একত্রে বসে সামাজিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা, কোন গোত্রের সাথে যুদ্ধ শুরু বা শেষ করা কিংবা সন্ধিচুক্তি করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করত। মক্কায় 'দারুন নাদওয়া' ছিল এজন্য বিখ্যাত।[১] তাদের মধ্যে মদ্যপানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। যুদ্ধ ও পেশীশক্তিই বিজয় লাভের মানদণ্ড ছিল। আরবের সামাজিক অবস্থাকে এক কথায় বলতে গেলে গরমযঃ রং জরমযঃ তথা 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিতে পরিচালিত হ'ত। আজকের বিশ্ব ব্যবস্থা তার চাইতে মোটেই উন্নত নয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা : ব্যবসা ছিল তাদের প্রধান অবলম্বন। ত্বায়েফ, সিরিয়া, ইয়ামন প্রভৃতি উর্বর এলাকা ছাড়াও অন্যত্র পশু-পালন জনগণের অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল। উট ছিল বিশেষ করে দূরপাল্লার সফরের জন্য একমাত্র স্থল পরিবহন। গাধা, খচ্চর মূলতঃ স্থানীয় পরিবহনের কাজে

১. *'দারুন নাদওয়া' ছিল মসজিদে হারাম সংলগ্ন কুছাই বিন কেলাবের বাড়ী। ইসলামী যুগে এটি মসজিদুল হারামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।*

ব্যবহৃত হ'ত। মক্কার ব্যবসায়ীগণ শীতকালে ইয়ামনে ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় দূরপাল্লার ব্যবসায়িক সফর করত। আর্থিক লেনদেনে সূদের প্রচলন ছিল। তারা চক্রবৃদ্ধি হারে পরস্পরকে সূদভিত্তিক ঋণ দিত। রাস্তা-ঘাটে প্রায়ই ব্যবসায়িক কাফেলা লুট হ'ত। সেজন্য সশস্ত্র যোদ্ধাদল নিয়ে ব্যবসায়ী কাফেলা রওয়ানা হ'ত। তবে কা'বা গৃহের খাদেম হওয়ার সুবাদে মক্কার ব্যবসায়িক কাফেলা বিশেষভাবে মর্যাদামণ্ডিত ছিল এবং সর্বত্র নিরাপদ থাকত। বছরের আট মাসে লুটতরাজের ভয় থাকলেও বাকী চারমাসে তারা নিশ্চিন্তে ব্যবসা করত। এই সময় ওকাযের মেলা ছাড়াও আরবের বিভিন্ন প্রান্তে আরও অনেকগুলি বড় বড় মেলা বসত। এইসব বাণিজ্য মেলায় প্রচুর বেচাকেনার মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা লাভবান হ'ত। তাদের মধ্যে বস্ত্র, চর্ম ও ধাতব শিল্পের প্রচলন ছিল। ইয়ামন, হীরা ও সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল এইসব শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল। তবে গৃহের আঙিনায় বসে সূতা কাটার কাজে অধিকাংশ আরব মহিলাকে নিয়োজিত দেখা যেত। কোন কোন এলাকায় কৃষিকাজ হ'ত। ছোলা, ভুট্টা, যব ও আঙ্গুরের চাষ হ'ত। মক্কা-মদীনায় গমের আবাদ ছিল না। আমীর মু'আবিয়ার খেলাফতকালে প্রথম সিরিয়া থেকে মদীনায় গম রফতানী করা হয়। খেজুর বাগান ব্যাপক হারে দেখা যেত। খেজুর ছিল তাদের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা।

তাদের কোন গোত্রীয় অর্থনৈতিক ফাণ্ড ছিল না। সেকারণ সমাজের লোকদের দারিদ্র্য ও রোগ-ব্যধি দূরীকরণে ও স্বাস্থ্য সেবার কোন সমন্বিত কর্মসূচী ও কর্মপরিকল্পনা ছিল না। পারস্পরিক দান ও বদান্যতার উপরেই তাদের নির্ভর করতে হ'ত। নিখাদ পুঁজিবাদী অর্থনীতি চালু ছিল। যার ফলে সমাজে একদল উচ্চবিত্ত থাকলেও অধিকাংশ লোক বিত্তহীন ও মানবেতর জীবন যাপন করত। সাধারণ অবস্থা ছিল এই যে, আরবদের সহায়-সম্পদ তাদের জীবনমান উন্নয়নে ব্যয়িত না হয়ে সিংহভাগই ব্যয়িত হ'ত যুদ্ধ-বিগ্রহের পিছনে। ফলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। আজকের বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এর চেয়ে মোটেই উন্নত নয়। আরবীয় সমাজে উচ্চবিত্ত লোকদের মধ্যে মদ-জুয়া ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন ছিল। সেখানে বিত্তহীনরা দাস ও দাসীরূপে বিক্রয় হ'ত ও মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হ'ত।

নৈতিক অবস্থা :

উদার মরুচারী আরবদের মধ্যে নৈতিকতার ক্ষেত্রে দ্বিমুখী ধারা পরিলক্ষিত হ'ত। একদিকে যেমন তাদের মধ্যে মদ্যপান, ব্যভিচার, মারামারি-হানাহানি লেগে থাকত। অন্যদিকে তেমনি দয়া, উদারতা, সততা, পৌরুষ, সৎসাহস, ব্যক্তিত্ববোধ, সরলতা ও অনাড়ম্বরতা, দানশীলতা, আমানতদারী, মেহমানদারী, প্রতিজ্ঞা পরায়ণতা ইত্যাদি সদগুণাবলীর সমাবেশ দেখা যেত। তাদের কাব্য প্রিয়তা এবং উন্নত কাব্যালংকারের কাছে আধুনিক যুগের আরবী কবি-সাহিত্যিকরা কিছুই নয়। তাদের স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, একবার শুনলেই হুবহু মুখস্থ বলে দিত। বড় বড় ক্বাছীদা ও দীর্ঘ কবিতাগুলি তাদের মুখে মুখেই চালু ছিল। লেখাকে এজন্য তারা নিজেদের জন্য হীনকর মনে করত। দুর্বল স্মৃতির কারণে আজকের বিশ্ব লেখাকেই অধিক গুরুত্ব দেয়। অথচ লেখায় ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তৎকালীন আরবদের স্মৃতিতে ভুল কদাচিৎ হ'ত। সম্ভবতঃ এই সব সদ গুণাবলীর কারণেই বিশ্বনবীকে আল্লাহ বিশ্বকেন্দ্র মক্কাতেই প্রেরণ করেন। যাদের প্রখর স্মৃতিতে কুরআন ও হাদীছ অবিকৃত অবস্থায় নিরাপদ থাকে এবং পরবর্তীতে তা লিখিত আকারে সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়। যদিও কুরআন ও হাদীছ লিখিত ভাবেও তখন সংকলিত হয়েছিল।

উপসংহার

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল আরব ভূখণ্ডের মরুচারী মানুষেরা বিভিন্ন মানবিক দুর্বলতার অধিকারী হ'লেও তাদের মধ্যে উন্নত মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঈর্ষণীয়ভাবে পরিদৃষ্ট হ'ত। আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার অবতরণ স্থল হওয়ার কারণে এই ভূখণ্ড থেকেই মানব সভ্যতা ক্রমে পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডে বিস্তার লাভ করেছে। এই ভূখণ্ডে আরাফাত-এর না'মান উপত্যকায় সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ পাক সমস্ত মানবকূলের নিকট হ'তে তাঁর প্রভুত্বের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন *(আ'রাফ ৭/১৭২-১৭৩)*। একই সাথে তিনি সকল নবীর কাছ থেকে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে ঈমান আনা ও তাঁকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতার অঙ্গীকার নেন *(আলে ইমরান ৩/৮১)*।

এই ভূখণ্ডেই হাযার হাযার নবী ও রাসূলের আগমন ঘটেছে। এই ভূখণ্ডেই আল্লাহ্‌র ঘর কা'বাগৃহ অবস্থিত। এই ভূখণ্ড বাণিজ্যিক কারণে সারা বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। জান্নাতের ভাষা আরবী এই ভূখণ্ডের কথিত ও প্রচলিত ভাষা ছিল। সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং সততা ও আমানতদারীর অনুপম গুণাবলীর প্রেক্ষাপটে আরব ভূমির কেন্দ্রবিন্দু মক্কাভূমির অভিজাত বংশ কা'বা গৃহের তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর নিকটেই আল্লাহ মানবজাতির কল্যাণে প্রেরিত শ্রেষ্ঠতম নে'মত কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আমানত সমর্পণ করেন।

ফালিল্লা-হিল হাম্দ। এক্ষণে আমরা নবীজীবনের মূল আলোচনায় অগ্রসর হব।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ-১ :

(১) বিশ্বনবী ও শেষনবী হবার কারণেই বিশ্বকেন্দ্র মক্কাতে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করা হয়।

(২) সারা বিশ্বে তাওহীদের দাওয়াত দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তৎকালীন বিশ্বের সেরা বাণিজ্য কেন্দ্র ও যোগাযোগ কেন্দ্র আরব ভূখণ্ডে শেষনবী প্রেরিত হন।

(৩) তাওরাত-ইঞ্জীল হিব্রু ভাষায় নাযিল হয়। কিন্তু কুরআন নাযিল হয়েছে জান্নাতী ভাষা আরবীতে। তাই আল্লাহ্র ঘরের তত্ত্বাবধায়ক শুদ্ধভাষী আরব তথা কুরায়েশ বংশে শেষনবীর আগমন ঘটে।

(৪) আধুনিক মুদ্রণযন্ত্র সে যুগে ছিল না। তাই প্রখর স্মৃতিধর আরবদের নিকটেই কুরআন ও সুন্নাহ্র অমূল্য নে'মত সংরক্ষণের আমানত সমর্পণ করা হয়।

(৫) আরবরা ছিল আজন্ম স্বাধীন ও বীরের জাতি। তাই তৎকালীন রোমক ও পারসিক পরাশক্তির মুকাবিলায় ইসলামী খেলাফতের বাস্তবায়নের জন্য শেষনবীর আগমন স্থল ও কর্মস্থল হিসাবে আরব ভূখণ্ডকে নির্বাচন করা হয়।

রাসূলের মাক্কী জীবন :

নবী জীবনকে আমরা প্রধান দু'টি ভাগে ভাগ করে নেব- মাক্কী জীবন ও মাদানী জীবন। মক্কায় তাঁর জন্ম, বৃদ্ধি ও নবুঅত লাভ এবং মদীনায় তাঁর হিজরত, ইসলামের বাস্তবায়ন ও ওফাত লাভ। অতঃপর প্রথমেই তাঁর বংশ পরিচয় ও জন্ম বৃত্তান্ত।

বংশ পরিচয় :

ইবরাহীম (আঃ)-এর দুই পুত্র ছিলেন ইসমাঈল ও ইসহাক্ব। ইসমাঈলের মা ছিলেন বিবি হাজেরা এবং ইসহাকের মা ছিলেন বিবি সারা। দুই ছেলেই 'নবী' হয়েছিলেন। ছোট ছেলে ইসহাক্বের পুত্র ইয়াকূব ও 'নবী' ছিলেন এবং তার অপর নাম ছিল 'ইস্রাঈল' অর্থ 'আল্লাহ্র দাস'। তাঁর বারোটি পুত্রের বংশধরগণের মধ্যে যুগ যুগ ধরে হাযার হাযার নবীর জন্ম হয়। ইউসুফ, মূসা, হারূণ, দাঊদ, সুলায়মান ও ঈসা (আলাইহিমুস সালাম) ছিলেন এই বংশের সেরা নবী ও রাসূল। বলা চলে যে, আদম (আলাইহিস সালাম) হ'তে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত হযরত নূহ ও ইদরীস (আঃ) সহ ৮/৯ জন নবী ছাড়া এক লক্ষ চব্বিশ হাযার পয়গম্বরের প্রায় সকলেই ছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক (আঃ)-এর বংশধর অর্থাৎ বনু ইস্রাঈল। যাদের সর্বশেষ নবী ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)। অন্যদিকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে একজন মাত্র নবীর জন্ম হয় এবং তিনিই হ'লেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ *(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*। ফলে আদম (আঃ) যেমন ছিলেন মানবজাতির আদি পিতা, নূহ (আঃ) ছিলেন মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা, তেমনি ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন তাঁর পরবর্তী সকল নবী ও তাঁদের অনুসারী উম্মতে মুসলিমাহ্র পিতা *(হজ্জ ২২/৭৮)*। ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র হুকুমে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী হাজেরা ও তার পুত্র ইসমাঈলকে মক্কায় রেখে আসেন ও মাঝে-মধ্যে গিয়ে তাদের দেখাশুনা করতেন। তাঁরা সেখানেই আমৃত্যু বসবাস করেন। অন্যদিকে তাঁর প্রথমা স্ত্রী সারা ও তার পুত্র ইসহাক্ব ও অন্যদের নিয়ে তিনি কেন'আনে (ফিলিস্তীনে) বসবাস করতেন এবং এখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে ইবরাহীম (আঃ)-এর দুই পুত্রের মাধ্যমে মক্কা ও ফিলিস্তীন দুই এলাকায় তাওহীদের প্রচার ও প্রসার ঘটে।

কুরআনে বর্ণিত পঁচিশ জন নবীর মধ্যে আদম, নূহ, ইদরীস ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) বাদে বাকী ২১ জন নবী ছিলেন বনু ইস্রাঈল এবং একমাত্র মুহাম্মাদ হ'লেন বনু ইসমাঈল। বলা চলে যে, এই বৈমাত্রেয় পার্থক্য উম্মতে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে ইহুদী-নাছারাদের বিদ্বেষের অন্যতম কারণ ছিল। সেজন্যে তারা চিনতে পেরেও শেষনবীকে মানেনি *(বাক্বারাহ ২/১৪৬; আন'আম ৬/২০)*।

এক্ষণে আমরা ইবরাহীম বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মানবজাতির গৌরব মুকুট, বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম ও বংশ পরিচয় তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

জন্ম ও মৃত্যু :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১ম হস্তীবর্ষের ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার ছুবহে ছাদিকের পর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১ হিজরী সনের ১২ই রবীউল আউয়াল সোমবার সকালে ৯/১০টার দিকে চান্দ্র বর্ষের হিসাবে ৬৩ বছর ৪দিন বয়সে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। সৌরবর্ষ হিসাবে জন্ম ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল সোমবার এবং মৃত্যু ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন সোমবার। বয়স ৬১ বছর ১ মাস ১৪ দিন। তাঁর জন্ম হয়েছিল আবরাহা কর্তৃক কা'বা আক্রমণের ৫০ অথবা ৫৫ দিন পরে। এটা ছিল ইবরাহীম (আঃ) থেকে ২৫৮৫ বছর ৭ মাস ২০ দিন পরের এবং নূহের তূফানের ৩৬৭৫

বছর পরের ঘটনা। রাসূল (ছাঃ) দুনিয়াতে বেঁচে ছিলেন মোট ২২,৩৩০ দিন ৬ ঘণ্টা। তন্মধ্যে তাঁর নবুঅত কাল ছিল ৮১৫৬ দিন। এ হিসাব হ'ল সুলায়মান মানছূরপুরীর। সঠিক হিসাব আল্লাহ জানেন।

বংশ : তিনি মক্কার কুরায়েশ বংশের শ্রেষ্ঠ শাখা হাশেমী গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ, মাতার নাম আমেনা, দাদার নাম আব্দুল মুত্ত্বালিব, দাদীর নাম ফাতেমা। নানার নাম ওয়াহাব, নানীর নাম বাররাহ। নানার বংশসূত্র রাসূলের ঊর্ধ্বতন দাদা কিলাব-এর সাথে এবং নানীর বংশসূত্র কুছাই-এর সাথে যুক্ত হয়েছে। নানা ওয়াহাব বনু যোহরা গোত্রের সরদার ছিলেন। দাদার হাশেমী গোত্র ও নানার যোহরা গোত্র কুরায়েশ বংশের দুই বৃহৎ ও সম্ভ্রান্ত গোত্র হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল।

বংশধারা (শাজারাহ্) :

তাঁর বংশধারাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। ১ম ভাগে মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'তে ঊর্ধ্বতন পুরুষ আদনান পর্যন্ত ২২টি স্তর। যে ব্যাপারে কারু কোন মতভেদ নেই। এর উপরে ২য় ভাগে আদনান থেকে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত ৪১টি স্তর এবং তার উপরে তৃতীয় ভাগে ইবরাহীম (আঃ) হ'তে আদম (আঃ) পর্যন্ত ১৯টি স্তর। যেখানে নাম ও স্তরের ব্যাপারে বিদ্বানগণের মতভেদ রয়েছে। আমরা নিম্নে আদনান পর্যন্ত বংশধারা উল্লেখ করলাম।-

(১) মুহাম্মাদ বিন (২) আব্দুল্লাহ বিন (৩) আব্দুল মুত্ত্বালিব বিন (৪) হাশেম বিন (৫) আবদে মানাফ বিন (৬) কুছাই বিন (৭) কিলাব বিন (৮) মুররাহ বিন (৯) কা'ব বিন (১০) লুওয়াই বিন (১১) গালিব বিন (১২) ফিহ্র (লকব কুরায়েশ) বিন (১৩) মালেক বিন (১৪) নাযার বিন (১৫) কানানাহ বিন (১৬) খুযায়মা বিন (১৭) মুদরেকাহ বিন (১৮) ইলিয়াস বিন (১৯) মুযার বিন (২০) নাযার বিন (২১) মা'দ বিন (২২) আদনান। এর মধ্যে পরদাদা হাশেম-এর নামে হাশেমী গোত্র এবং দ্বাদশতম পুরুষ ফিহ্র যার উপাধি ছিল কুরায়েশ, তার নামানুসারে কুরায়েশ বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। কুরায়েশ অর্থ সাগরের তিমি মাছ। ইয়ামনের বাদশাহ হাসসান মক্কা আক্রমণ করে কা'বা উঠিয়ে নিজ দেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। ফিহ্র তাকে যুদ্ধে হারিয়ে তিন বছর বন্দী করে রাখেন। অতঃপর তাকে মুক্তি দেন। হাসসান ইয়ামনে ফেরার পথে রাস্তায় মারা যায়। এই ঘটনার পর থেকে ফিহ্র 'আরবের কুরায়েশ' বলে খ্যাতি লাভ করেন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় বংশ সম্পর্কে বলেন,

إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشمٍ واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم عن واثلة بن الأسقع.

'আল্লাহ ইবরাহীমের সন্তানগণের মধ্য থেকে ইসমাঈলকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর ইসমাঈলের সন্তানগণের মধ্য থেকে বনু কানানাহকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর বনু কানানাহ থেকে কুরায়েশ বংশকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর কুরায়েশ থেকে বনু হাশেমকে এবং বনু হাশেম থেকে আমাকে বেছে নিয়েছেন।[২]

শুধু তাই নয়, তিনি বলতেন, আমি আমার পিতা ইবরাহীমের দো'আ ও ঈসার সুসংবাদ (এর ফসল)'।[৩] কেননা ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহ নির্মাণের সময় দো'আ করেছিলেন, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায়-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

'হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি তাদের মধ্য হ'তে একজনকে তাদের মধ্যে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করুন, যিনি তাদের নিকটে আপনার আয়াত সমূহ পাঠ করে শুনাবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (সুন্নাহ) শিক্ষা দিবেন ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন' *(বাক্বারাহ ২/১২৯)*।

পিতা-পুত্রের এই মিলিত দো'আ দুই হাযারের অধিক বছর পরে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ লাভ করে।

একইভাবে ঈসা (আঃ) স্বীয় কওমকে উদ্দেশ্য করে শেষনবী আগমনের সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন, যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّـهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ-

২. *ছহীহ মুসলিম, ওয়াছেলাহ ইবনুল আসক্বা' হ'তে; মিশকাত হা/৫৭৪০ 'ফাযায়েল' অধ্যায়।*

৩. *আহমাদ, ইবনু হিব্বান, আবু উমামাহ হ'তে; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫৪৫।*

'স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা বলেছিল, হে বনু ইস্রাঈলগণ! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যয়নকারী এবং আমি এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন, তার নাম আহমাদ...' *(ছফ ৬১/৬)*।

পিতা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে পিতার হুকুমে ইয়াছরিব (মদীনা) গেলে সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মাত্র ২৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন ও সেখানে নাবেগা জা'দীর গোত্রে সমাধিস্থ হন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মের পূর্বে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়ে যায়।

খাৎনা ও নামকরণ :

প্রচলিত প্রথা মোতাবেক সপ্তম দিনে নবজাতকের খাৎনা ও নামকরণ করা হয়। পিতৃহীন নবজাতককে কোলে নিয়ে স্নেহশীল দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন। তিনি সেখানে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন ও প্রাণভরে দো'আ করেন। আক্বীক্বার দিন সমস্ত কুরায়েশ বংশের লোককে দাওয়াত করে খাওয়ান। সকলে জিজ্ঞেস করলে তিনি বাচ্চার নাম বলেন, 'মুহাম্মাদ'। এই অপ্রচলিত নাম শুনে লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি চাই যে, আমার বাচ্চা সারা দুনিয়ায় 'প্রশংসিত' হৌক। ওদিকে স্বপ্নের মাধ্যমে ফেরেশতার দেওয়া প্রস্তাব অনুযায়ী মা আমেনা তার নাম রাখেন 'আহমাদ'। উভয় নামের অর্থ প্রায় একই। অর্থাৎ 'প্রশংসিত' এবং 'সর্বাধিক প্রশংসিত'। উভয় নামই কুরআনে এসেছে। যেমন 'মুহাম্মাদ' নাম এসেছে চার জায়গায়। যথাক্রমে- সূরা আলে ইমরান ৩/১৪৪, আহযাব ৩৩/৪০; মুহাম্মাদ ৪৭/২ এবং ফাৎহ ৪৮/২৯। তাছাড়া 'মুহাম্মাদ' নামেই একটি সূরা নাযিল হয়েছে সূরা মুহাম্মাদ (৪৭ নং)। অনুরূপভাবে 'আহমাদ' নাম এসেছে এক জায়গায় *(ছফ ৬১/৬)*।

কথিত আছে যে, (১) রাসূল খাৎনা করা অবস্থায় জামা-পাজামা পরে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন, যাতে কেউ তার লজ্জাস্থান দেখতে না পায়। (২) এছাড়াও কথিত আছে যে, জান্নাত থেকে আসিয়া ও মারিয়াম নেমে এসে ধাত্রীর কাজ করেন। (৩) আরও কথিত আছে যে, রাসূলের জন্মের সংবাদ শুনে চাচা আবু লাহাব আনন্দে আত্মহারা হয়ে মক্কার অলি-গলিতে এই সুসংবাদ শুনানোর জন্য দৌড়ে যান এবং তাকে প্রথম সংবাদ দানকারিণী দাসী ছুওয়াইবাকে খুশীর নিদর্শন স্বরূপ মুক্ত করে দেন। মীলাদের মজলিসে আরও বলা হয়ে থাকে যে, রাসূল জন্মের সংবাদ দেবার সময় আবু লাহাবের শাহাদাত অঙ্গুলী উঁচু ছিল বিধায় খুশীতে সেটি জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ থাকবে। বলা বাহুল্য, এসবই ভিত্তিহীন কল্প কথা মাত্র। (৪) বিশ্বসেরা জীবনীগ্রন্থ হিসাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত আর-রাহীকুল মাখতূমেও কিছু অশুদ্ধ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, যা উক্ত গ্রন্থের উচ্চ মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে। যেমন (ক) রাসূল জন্মের সময় তার মা বলছেন যে, আমার গুপ্তাঙ্গ দিয়ে 'নূর' অর্থাৎ জ্যোতি বিকশিত হয়েছিল। যা সিরিয়ার প্রাসাদ সমূহকে আলোকিত করেছিল (খ) পারস্যের কিসরা রাজপ্রাসাদের ১৪টি চূড়া ভেঙ্গে পড়েছিল (গ) অগ্নি উপাসক মজূসীদের পূজার আগুন নিভে গিয়েছিল (ঘ) বাহীরাহর পার্শ্ববর্তী গীর্জাসমূহ ধ্বসে পড়েছিল ইত্যাদি *(পৃঃ ৫৪)*। উল্লেখ্য যে, অনুবাদক তার অগণিত ভুল অনুবাদের মধ্যে ঐ সাথে এটাও যোগ করেছেন যে, (ঙ) ঐ সময় কা'বা গৃহের ৩৬০টি মূর্তি ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে' *(পৃঃ ৭৬), প্রকাশক: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা সেপ্টেম্বর ২০০৯)*।

রাসূলের নাম সমূহ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إن لى أسماء أنا محمد وأنا أحمـــد وأنا الماحي الذي محا الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي لا نـــبي بعــــدي، رواه مسلم عن جبير بن مطعم– 'আমার কয়েকটি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ (প্রশংসিত), আমি আহমাদ (সর্বাধিক প্রশংসিত), আমি 'মাহী' (বিদূরিতকারী) আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফরীকে বিদূরিত করেছেন। আমি 'হাশের' (জমাকারী) কেননা সমস্ত লোক ক্বিয়ামতের দিন আমার কাছে জমা হবে (এবং শাফা'আতের জন্য অনুরোধ করবে)। আমি 'আক্বেব' (সর্বশেষে আগমনকারী) আমার পরে আর কোন নবী নেই'।[৪] সুলায়মান মানছূরপুরী বলেন, উক্ত নাম সমূহের মধ্যে মুহাম্মাদ ও আহমাদ হ'ল তাঁর মূল নাম এবং বাকীগুলো হ'ল তাঁর গুণবাচক নাম। সেজন্য তিনি সেগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। এই গুণবাচক নামের সংখ্যা মানছূরপুরী গণনা করেছেন ৫৪টি। তিনি ৯২টি করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন।

(ক) রাসূলের মৃত্যুর পরে কন্যা ফাতেমার শোকগাথাতেও 'আহমাদ' নাম এসেছে। যেমন-

صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبُ لَوْ أَنَّهَا * صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ صِرنَ لَيَالِيَا

مَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ أَحْمَدَ * أَنْ لاَ يَشَمَّ مُدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا

৪. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৭৬-৭৭, 'ফাযায়েল' অধ্যায় 'রাসূলের নাম সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

(১) আমার উপরে এমন বিপদ আপতিত হয়েছে, যদি তা দিনের উপরে পড়ত, তবে তা রাতে পরিণত হয়ে যেত।

(২) যে কেউ আহমাদের কবরের মাটি শুঁকবে, তার উপরে ওয়াজিব হবে যে সে সারাটি জীবনে আর কোন সুগন্ধি শুঁকবে না'।

এমনি ভাবে কট্টরপন্থী খারেজীরা যখন আলী (রাঃ)-কে নতুনভাবে তাদের সামনে ঈমান আনতে ও ইসলামে দাখিল হ'তে বলে, তখন তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন,

يا شاهد الخير عليَّ فاشهد * إني على دين النبي أحمد

مَنْ شَكَّ في الله فإني مهتدي-

'আমার উপরে হে কল্যাণের সাক্ষী সাক্ষী থাক, নিশ্চয়ই আমি নবী আহমাদের দ্বীনের উপরে রয়েছি, আল্লাহ্র ব্যাপারে যে সন্দেহ পোষণ করে সে জেনে রাখুক যে, আমি হেদায়াত প্রাপ্ত'। উল্লেখ্য যে, চরমপন্থী খারেজীরা আলী (রাঃ)-কে 'কাফের' ফৎওয়া দিয়ে তাঁকে ফজরের জামা'আতে মসজিদে যাওয়ার সময় মর্মান্তিকভাবে হত্যা করেছিল এবং হত্যাকারী আব্দুর রহমান নির্বিকারভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছিল, 'আমি খুবই আনন্দিত এজন্য যে, আমি আজ 'আল্লাহ্র নিকৃষ্টতম সৃষ্টি'-কে হত্যা করেছি'।

(খ) ওদিকে 'মুহাম্মাদ' নামের প্রশংসায় কবি হাসসান বিন ছাবেত আনছারী (রাঃ) গেয়েছেন-

وَشقَّ له من اسمه لِيُجِلَّهُ * فذو العرش محمود وهذا محمد

'তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ নিজের নাম থেকে তার নাম বের করেছেন। তাই আরশের মালিক হ'লেন মাহমূদ এবং ইনি হ'লেন মুহাম্মাদ'।

উল্লেখ্য যে, ক্বিয়ামতের দিন রাসূলের শাফা'আতের স্থানের নাম হবে 'মাক্বামে মাহমূদ'।

ধাত্রীগৃহে মুহাম্মাদ :

সে সময়ে শহরবাসী আরবদের মধ্যে এই প্রথা চালু ছিল যে, শহরের জনাকীর্ণ পংকিল পরিবেশ থেকে দূরে গ্রামের উন্মুক্ত পরিবেশে শিশুদের লালন-পালন করলে তারা বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি হ'তে মুক্ত থাকে এবং তাদের স্বাস্থ্য সুঠাম ও সবল হয়। সর্বোপরি তারা বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হয়। সে হিসাবে দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ধাত্রী হিসাবে বনু সা'দ গোত্রের হালীমা সা'দিয়াহকে নির্বাচন করেন এবং তার হাতেই প্রাণাধিক পৌত্রকে সমর্পণ করেন। হালীমা গৃহে দু'বছর দুগ্ধপানকালীন সময়ে তাদের পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে আসে। তাদের ছাগপালে এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে আল্লাহ্র তরফ থেকে বরকত নেমে আসে। নিয়মানুযায়ী দু'বছর পরে বাচ্চাকে ফেরত দেওয়ার জন্য তাঁকে তার মা আমেনার কাছে আনা হয়। কিন্তু হালীমা তাকে ছাড়তে চাচ্ছিলেন না। তিনি মা আমেনাকে বারবার অনুরোধ করেন আরও কিছুদিন বাচ্চাকে তার কাছে রাখার জন্য। ঐ সময় মক্কায় মহামারী দেখা দিয়েছিল। ফলে মা আমেনা রাযী হয়ে যান এবং বাচ্চাকে পুনরায় হালীমার কাছে অর্পণ করেন।

বক্ষ বিদারণ :

দ্বিতীয় দফায় হালীমার নিকটে আসার পর জন্মের চতুর্থ কিংবা পঞ্চম বছরে শিশু মুহাম্মাদের সীনা চাক বা বক্ষ বিদারণের বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। ব্যাপারটি ছিল এই যে, মুহাম্মাদ অন্যান্য সাথীদের সাথে খেলছিলেন। এমন সময় জিবরাঈল ফেরেশতা এসে তাকে অনতিদূরে নিয়ে বুক চিরে ফেলেন। অতঃপর কলীজা বের করে যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে কিছু জমাট রক্ত ফেলে দিলেন এবং বললেন, هذا حظ الشيطان منك 'শয়তানের যে অংশ তোমার মধ্যে ছিল, সেটা এই'। অতঃপর বুক পূর্বের ন্যায় জোড়া লাগিয়ে দিয়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পুরা ব্যাপারটি খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়ে যায়। সাথী বাচ্চারা ছুটে গিয়ে হালীমাকে খবর দিল যে, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। তিনি ছুটে এসে দেখেন যে, মুহাম্মাদ মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে'।[৫] হালীমা তাকে বুকে তুলে বাড়ীতে এনে সেবাযত্ন করতে থাকেন। এই অলৌকিক ঘটনায় হালীমা ভীত হয়ে পড়েন এবং একদিন তাঁকে তার মায়ের কাছে ফেরত দিয়ে যান। তখন তার বয়স ছয় বছর।

আমেনার ইয়াছরিব গমন ও মৃত্যুবরণ :

প্রাণাধিক সন্তানকে কাছে পেয়ে আমেনা তার প্রাণপ্রিয় স্বামীর কবর যেয়ারত করার মনস্থ করেন। শ্বশুর আব্দুল মুত্ত্বালিব সব ব্যবস্থা করে দেন। সেমতে পুত্র মুহাম্মাদ ও পরিচারিকা উম্মে আয়মনকে নিয়ে তিনি মক্কা হ'তে ৫০০ কিঃ মিঃ দূরে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অতঃপর যথাসময়ে মদীনায় পৌঁছে নাবেগা আল-জা'দী পরিবারের গোরস্থানে স্বামীর কবর যেয়ারত করেন। অতঃপর সেখানে এক মাস বিশ্রাম নেন। এরপর পুনরায় মক্কার উদ্দেশ্যে

৫. *মুসলিম, আনাস (রাঃ) হ'তে; মিশকাত হা/৫৮৫২ 'নবুঅতের নিদর্শন সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

রওয়ানা হন। কিন্তু কিছু দূর এসেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ও 'আবওয়া' নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। উম্মে আয়মন শিশু মুহাম্মাদকে মক্কায় নিয়ে আসেন। এভাবে জন্ম থেকে পিতৃহারা ইয়াতীম মুহাম্মাদ মাত্র ৬ বছর বয়সে মাকে হারিয়ে পুনরায় ইয়াতীম হ'লেন।

দাদার স্নেহনীড়ে মুহাম্মাদ :

ইয়াতীম মুহাম্মাদ এবার এলেন প্রায় ৮০ বছরের বৃদ্ধ দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিবের স্নেহনীড়ে। আব্দুল মুত্ত্বালিব নিজেও ছিলেন জন্ম থেকে ইয়াতীম। পিতা কুরায়েশ নেতা হাশেম ফিলিস্তীনের গাযায় মৃত্যু বরণ করলে তিনি ১০ বছর পর্যন্ত ইয়াছরিবে তার মায়ের কাছে প্রতিপালিত হন। ব্যাপারটা ছিল এই যে, ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়ায় যাওয়ার পথে হাশেম ইয়াছরিবে জনৈকা সালমা বিনতে আমরের সাথে বিবাহিত হন ও সেখানে কিছু দিন অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি সিরিয়ায় গমন করেন ও ফিলিস্তীনের গাযায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর এই বিয়ে ও সন্তান জন্মের খবর মক্কার অভিভাবকরা জানতেন না। ১০ বছর পর তার জন্মের খবর জানতে পেরে চাচা কুরায়েশ নেতা মুত্ত্বালিব বিন আবদে মানাফ তাকে মক্কায় নিয়ে আসেন। লোকেরা তাকে মুত্ত্বালিবের ক্রীতদাস মনে করে তাকে 'আব্দুল মুত্ত্বালিব' বলেছিল সেই থেকে তিনি উক্ত নামে পরিচিত হন। যদিও তাঁর আসল নাম ছিল 'শায়বাহ' অর্থ 'সাদা চুল'। কারণ জন্ম থেকেই তার মাথার চুল ছিল সাদা। সেই শিশু কালের ইয়াতীম আব্দুল মুত্ত্বালিব আজ বৃদ্ধ বয়সে নিজ ইয়াতীম পৌত্রের অভিভাবক হন। কিন্তু এ স্নেহনীড় বেশী দিন স্থায়ী হয়নি।

মাত্র দু'বছর পরে শিশু মুহাম্মাদের বয়স যখন ৮ বছর ২ মাস ১০দিন, তখন তার দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব ৮২ বছর বয়সে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। ফলে তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী আপন চাচা আবু ত্বালিব তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ তিনি ভাতীজার অভিভাবক হিসাবে জীবনপাত করেন।

শিশু মুহাম্মাদের কিছু বরকত মণ্ডিত নিদর্শন :

(১) হালীমা সা'দিয়াহ বলেন, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় আমার বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল। বাহন মাদী গাধাটির অবস্থাও ছিল তদ্রূপ। কেননা এই সময় আরব ভূমিতে দুর্ভিক্ষের বছর চলছিল। ফলে বেশী অর্থ পাবে না বলে ইয়াতীম মুহাম্মাদকে কেউ নিতে চাচ্ছিল না। অবশেষে আমি তাকে নিতে সম্মত হ'লাম। অতঃপর যখন তাকে বুকে রাখলাম, তখন সে এবং আমার গর্ভজাত সন্তান দু'জনে পেটভরে আমার বুকের দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে গেল। ওদিকে উটনীর পালান দুধে ভরে উঠল। যার দুধ আমরা সবাই তৃপ্তির সাথে পান করলাম। তখন আমার স্বামী হারেছ বললেন, হালীমা। আল্লাহ্র শপথ! তুমি এক মহাভাগ্যবান সন্তান লাভ করেছ'। তারপর বাড়ীতে ফিরে আসার সময় দেখা গেল যে, আমাদের সেই দুর্বল মাদী গাধাটি এত তেযী হয়ে গেছে যে, কাফেলার সবাইকে পিছনে ফেলে সে এগিয়ে যাচ্ছে। যা দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল।

(২) বাড়ীতে ফিরে এসে দেখা গেল আমাদের রাখাল যে চারণভূমিতে পশুপাল নিয়ে যেত অন্যান্য রাখালরাও সেখানে তাদের পশুপাল নিয়ে যেত। কিন্তু তাদের পশুগুলো ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরত। অথচ আমাদের পশুপাল পরিতৃপ্ত অবস্থায় এবং পালানে দুধভর্তি অবস্থায় বাড়ী ফিরত। এভাবে আমরা প্রতিটি ব্যাপারেই বরকত লক্ষ্য করলাম এবং আমাদের সংসারে সচ্ছলতা ফিরে এল।

(৩) কা'বা চত্বরের যে নির্দিষ্ট স্থানটিতে দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব বসতেন, সেখানে তার জন্য নির্দিষ্ট আসনে কেউ বসতো না। কিন্তু শিশু মুহাম্মাদ ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি এসে সরাসরি দাদার আসনেই বসে পড়তেন। তার চাচারা তাকে সেখান থেকে নামিয়ে দিতে চাইলে দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব তাকে নিজের কাছেই বসাতেন ও গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলতেন, دعوا إبني هذا فو الله إن له لشأنا 'আমার এ বেটাকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ্র কসম এর মধ্যে বিশেষ কিছু শুভ লক্ষণ আছে'।

(৪) দাদার মৃত্যুর পর শিশু মুহাম্মাদ চাচা আবু ত্বালিবের নিকটে লালিত-পালিত হন। আবু ত্বালিব তখন কুরায়েশগণের সরদার। বৃষ্টির অভাবে মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। লোকেরা এসে আবু ত্বালিবকে বলল, চলুন সবাই আল্লাহ্র নিকটে পানি প্রার্থনা করি। আবু ত্বালিব শিশু মুহাম্মাদকেও সাথে নিলেন এবং কা'বা গৃহের দেয়াল ঘেঁষে নিজের কাছে দাঁড় করিয়ে পানি প্রার্থনা করলেন। এমন সময় আকাশ জুড়ে মেঘের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। অতঃপর মুষলধারে বৃষ্টি নেমে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ভরে উঠলো। তৃষিত মক্কায় আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে মুগ্ধ-বিস্মিত আবু ত্বালিব ভাতীজার প্রশংসায় বলেন,

وابيض يستقسى الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة الأرامل

'শুভ্র দর্শন (মুহাম্মাদ) যার চেহারার অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। সে যে ইয়াতীমদের আশ্রয়স্থল ও বিধবাদের রক্ষক'।

[ক্রমশঃ]

ইসলামে ভ্রাতৃত্ব

ড.এ.এস.এম.আযীযুল্লাহ

ভূমিকা :

সুবিশাল সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হ'ল মানুষ। পৃথিবীর সকল মানুষ এক আদমের সন্তান। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَّنِسَاءً. 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। এ দু'জন থেকে অসংখ্য নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন' *(নিসা ৪/১)*। সেই সুবাদে জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষ আদম-হাওয়া পরিবারের সদস্য এবং পরস্পর ভাই ভাই।

প্রত্যেক মানুষ স্বভাবধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ ثُمَّ يَقُوْلُ : فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ.

'প্রত্যেক সন্তান ফিতরাত (স্বভাবধর্ম)-এর উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়। যেভাবে পশু পূর্ণাঙ্গ পশুই প্রসব করে, তাতে তোমরা কোন কানকাটা দেখ কি? (দেখ না। অতঃপর মানুষ তার কান কেটে, নাক ছিদ্র করে বিকলাংগ করে দেয়)। অতঃপর তিনি (এর প্রমাণে এই আয়াতটি) পাঠ করলেন, আল্লাহ্‌র ফিতরাত যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটিই সরলসোজা মযবূত দ্বীন'।[১] আর মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হ'ল সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করা। শরীরের একটি অঙ্গ যেমন পৃথকভাবে কল্পনা করা যায় না, তেমনি সমাজে বসবাসকারী লোকদেরকেও পৃথকভাবে ভাবার কোন অবকাশ নেই। মানবজাতির আদি পিতা আদম (আঃ)-এর নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্যই সঙ্গী হিসাবে বিবি হাওয়া (আঃ)-এর সৃষ্টি এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না এবং বহুমুখী প্রয়োজন পূরণের তাগিদে মানুষকে সামাজিক পরিবেশে বসবাস করতে হয়। মানব জীবনে সমাজের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন, Man is dependent on society for protection, comfort, nurture, education, equipment, opportunity and the multitude of definite services which society provides. His birth in socicty brings with it the absolute need of society itself. 'মানুষ তার নিরাপত্তা, সুখ, পরিচর্যা, শিক্ষা, উপকরণ, সুযোগ-সুবিধা এবং সমাজের দেয়া বহুমুখী সেবাকার্যের জন্য সমাজের উপর নির্ভরশীল। সমাজে মানুষের জন্মগ্রহণই সমাজের প্রয়োজনীয়তার কথা সূচিত করে'।

মানুষ হিসাবে সমাজে সকল মানুষের মর্যাদা সমান। আলী (রাঃ) বলেন,

أَبُوْهُمْ آدَمُ وَالْأُمُّ حَوَّاءُ * اَلنَّاسُ مِنْ جِهَّةِ التَّمْثِيْلِ أَكْفَاءُ
وَأَعْظُمٌ خُلِقَتْ فِيْهَا وَأَعْظَاءُ.* نَفْسٌ كَنَفْسٍ وَأَرْوَاحٌ مُشَاكَلَةٌ

'আকৃতির দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান। তাদের বাবা আদম ও মা হাওয়া (আঃ)। মানুষের অন্তর এবং তাদের রূহগুলো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রত্যেকের দেহ হাড্ডি দ্বারা তৈরী। আর তাতে রয়েছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ'।[২] তবে কর্মে, জ্ঞানে, পদমর্যাদায় একজন অপরজন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। ইসলামী শরী'আতের বিধান মতে আরব-অনারব, সাদা-কালো, ধনী-গরীবের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। এক কথায় সকলেই আদম সন্তান, আর আদম মাটির তৈরী। তাই একজন মানুষের পক্ষে অন্য মানুষকে ঘৃণা করা, অবজ্ঞা করা, অপমান বা অসম্মান করা, হেয়জ্ঞান করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। বরং যে মানুষ আত্মমর্যাদার সঙ্গে পরমর্যাদার বিষয়টি সংযুক্ত করে আত্ম-পর এক করে গ্রহণ করে, সেই প্রকৃত মানুষ। আর একে অপরের প্রতি এই সহানুভূতিশীল মনোভাবকেই বলে 'ভ্রাতৃত্ব'।

আরবীতে أُخُوَّةٌ শব্দের অর্থ ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ইত্যাদি। তত্ত্বকথায় পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ নিবিড় সম্পর্ককে ভ্রাতৃত্ব বলা হয়। ইসলাম শান্তির ধর্ম, আর শান্তির অন্যতম নিয়ামক হ'ল ভ্রাতৃত্ব। বাস্তবতার নিরিখে বিশ্লেষণ করলে অর্থাৎ ব্যবহারিক দিক থেকে 'ভ্রাতৃত্ব' তিন প্রকার। যেমন- জন্মগত ভ্রাতৃত্ব, জাতিগত বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। এ তিনটি স্তর কমবেশী পরস্পরের পরিপূরক। ইসলামী শরী'আতে ভ্রাতৃত্বের উক্ত তিনটি স্তরই স্বীকৃত।

১. *মুত্তাফাক আলাইহ; মিশকাত হা/৯০।*

২. *দীওয়ানে আলী (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৫), পৃঃ ১৫।*

www.at-tahreek.com

জন্মগত ভ্রাতৃত্ব : একই ঔরসজাত পিতার সহোদর সন্তানের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব তাই জন্মগত ভ্রাতৃত্ব। আর এটিই সকল ভ্রাতৃত্বের উৎসমূল।

জাতিগত বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব : মানুষ সৃষ্টিগতভাবে যেমন পরস্পর ভাই ভাই, তেমনি ব্যবহারিক দিক থেকে লক্ষ্য করলেও দেখা যায়, মানুষ যে দেশের, ভাষার, গোত্রের, বর্ণের, পরিবেশের হোক না কেন, সকলের মৌলিক চাহিদা, অনুভূতি ও উপলব্ধির মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। শ্বসন প্রক্রিয়া, রেচনতন্ত্রের ক্রিয়া, শোণিত প্রবাহসহ বিভিন্ন প্রত্যঙ্গাদির ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সকল মানুষের একই। তাই বিশ্বের সকল মানুষ ভাই ভাই। এটাই হ'ল জাতিগত ভ্রাতৃত্ব বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব।

বিশ্বভ্রাতৃত্বের মূল উৎস হ'ল তাওহীদ। একজন মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব করবে, অন্য কারো নয়। তার উন্নত ললাট দুনিয়ার কোন মানুষের সামনে কিংবা দুর্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী বীরের কাছেও নত হবে না। সকলে আদম সন্তান হিসাবে ভাই ভাই। সুতরাং সবাই সবার সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে থাকবে এটাই মূলত তাওহীদের অন্তর্নিহিত দাবী।

কালের বিবর্তনে বনু আদমের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দূরত্ব, আবহাওয়া, ভৌগলিক পরিবেশসহ বিভিন্নমুখী প্রভাবে তারা নানা গোত্র, বর্ণ, আকার-আকৃতি, স্বভাব-প্রকৃতি ও ভাষার মানদণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। স্বতন্ত্র্য পরিচয়ে পরিচিত হয়ে ওঠার পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে তাদের আদি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনেও ফাটল ধরে। ফলশ্রুতিতে যত দিন যায় ততই তারা সৃষ্টির প্রকৃত পরিচয় ভুলে কার্যক্ষেত্রে একে অপরের শত্রুতে পরিণত হ'তে থাকে। ধন-সম্পদ, বংশ মর্যাদা এবং ভাষা ও বর্ণের মিথ্যা আভিজাত্যের দম্ভে মদমত্ত হয়ে তারা দিন দিন অন্ধ হয়ে পড়ে। যে কারণে অতি তুচ্ছ বিষয় ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি, কাটাকাটি, হিংসা-হানাহানী, খুন, রাহাজানী ইত্যাকার উচ্ছৃঙ্খল ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে মানুষ অহরহ লিপ্ত আছে। আর এই বংশ, গোত্র, অর্থ-সম্পদ, বর্ণ-রূপ, ভাষা-অঞ্চল, আকৃতি-প্রকৃতি ইত্যাদি ভেদবুদ্ধির কারণে পৃথিবীতে একশ্রেণীর মানুষ প্রভুত্বের আসনে সমাসীন হয়ে অন্য শ্রেণীকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখতে অভ্যস্থ।

ভারতীয়রা শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তাদের ছাড়া সারা দুনিয়ার মানুষকে 'ম্লেচ্ছ', 'অস্পৃশ্য', 'যবন' ইত্যাদি গণ্য করেছে। একই সাথে নিজেদেরকে ব্রাক্ষ্মন, খৈত্রীয়, শুদ্র ও বৈম্য এই চারটি বর্ণে বিভক্ত করে নিজেদের মধ্যে সম্মান ও অধিকারের তারতম্য সৃষ্টি করেছে। সেখানে শুদ্রদের ধর্ম-কর্ম করার অধিকার পর্যন্ত খর্ব করা হয়েছে। প্রাচীন ইরানীয়রাও এভাবে চারটি জাতিতে বিভক্ত ছিল। রোমানরা নিজেদেরকে প্রভুত্বের আসনে সমাসীন করে অন্যদেরকে গোলাম তুল্য জ্ঞান করত। প্রাচীন ইহুদীরা নিজেদের ব্যতীত দুনিয়ার সবাইকে পাপী ও ছোটলোক মনে করত। বনী ইসরাঈলরা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তান বলে গণ্য করত। আল্লাহ বলেন, وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّـــنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ. 'ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। আপনি বলুন, তবে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে কেন শাস্তি প্রদান করবেন? বরং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্ট মানবের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন' *(মায়েদাহ ৪/১৮)*। চীনের প্রাচীন নামই 'স্বর্গরাজ্য'। সুতরাং তাদের নিকট চীন বাদে সমগ্র পৃথিবী নরক তুল্য। ইউরোপে শ্বেতাঙ্গরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির একচ্ছত্র অধিকারী বলে দাবী করত। কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের সমপর্যায়ের বলে বিবেচিত হ'ত না। আমেরিকার মানবদরদীদের দৃষ্টিতে সেখানকার হাবশী বা নিগ্রো বাসিন্দাদের তো বেঁচে থাকারও কোন অধিকার ছিল না। এমনকি সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের সাথে পড়ার অধিকার পর্যন্ত পেত না। আর দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকায় কেবল হাবশীই নয়; বরং ভারতীয় তথা এশীয়রাও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। পার্থিব অধিকারের বিষয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিমণ্ডলের সীমা ছাড়িয়ে এসব ভেদাভেদ উপাসনালয় পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সৃষ্টিকর্তার দুই বান্দা একই উপাসনালয়ে প্রার্থনা করার কোন সুযোগ নেই। শ্বেতাঙ্গদের গির্জা আলাদা, কৃষ্ণাঙ্গদের গির্জা পৃথক। অথচ মানুষ একটিবারের জন্যও চিন্তা করে না যে, বাইরের ঐ পাতলা চামড়াটুকুর নীচে যে আসল প্রাণশক্তি রক্ত-ধারা, রাসায়নিক বিশ্লেষণে তাতে কোনই পার্থক্য নেই। আর মানুষে মানুষে গোত্র, ভাষা ও বর্ণের বিভাজনে তাদের নিজেদের তো কোন হাত নেই। এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়েছে, যার মূল এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল পারস্পরিক পরিচিতি; গর্ব-অহঙ্কর বা ঘৃণা করার জন্য নয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْباً وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ. 'হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ'তে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বহু সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে

তোমরা পরস্পর পরিচিত হ'তে পার। তবে আল্লাহ্‌র নিকটে সেই শ্রেষ্ঠ, যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর খবর রাখেন' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে এই যে বিভেদের প্রাচীর সহস্রাধিক বর্ষ হ'তে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে মানুষের জ্ঞান, পৌরুষ ও আত্মসম্মানকে নিরবে ধিক্কার দিচ্ছিল, মহানবী (ছাঃ) এসে সে বাধার প্রাচীর ভেঙে দিয়ে মহাসাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী উচ্চকিত করে মানুষের মৌলিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلاَ لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ وَلاَ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى. 'হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের সকলের প্রভু এক। অতএব অনারবীর উপর আরবের, আরবীর উপর অনারবের, লালের উপরে কালোর এবং কালোর উপরে লালের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই তাক্বওয়া ব্যতীত।[৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, النَّاسُ بَنُوْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ 'প্রত্যেক মানুষ আদম সন্তান, আর আদম মাটির তৈরী'।[৪]

মানবতার চিরন্তন আকাঙ্খা হচ্ছে বিশ্বজুড়া প্রেম, ভালবাসা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সুনিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করা। বিশ্বের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের উচিত বিশ্বভ্রাতৃত্বের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে কল্যাণের অনুগামী হওয়া। আর এটাই মূলতঃ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। ইসলাম কোন অবস্থাতেই ভাইয়ে ভাইয়ে বিভেদকে সমর্থন করে না।

পৃথিবীর সকল মানবের মূলে আছে এক জোড়া মানব-মানবী আদম ও হাওয়া (আঃ)। সংখ্যাধিক্যের কারণে আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন বর্ণে, গোত্রে ও ভাষায় বিভক্ত করেছেন শুধুমাত্র পারস্পরিক পরিচিতির জন্য, গর্ব-ঘৃণা বা ঝগড়-বিবাদ করার জন্য নয়। কেননা আল্লাহ্‌র নিকটে শ্রেষ্ঠত্ব বা সম্মানের মাপকাঠি একটাই, তা হ'ল তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। তাছাড়া বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র হাযারো নিদর্শনের মধ্যে ভাষা ও বর্ণের বিভাজন অন্যতম নিদর্শন। মহান আল্লাহ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِيْنَ. 'তার নিদর্শনের মধ্যে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে পৃথিবীবাসীর জন্য নিদর্শনাবীল রয়েছে' *(রূম ৩০/২২)*। অর্থাৎ মানুষে মানুষে ভাষা ও বর্ণের বিভাজন ঘৃণা বা অহংকার করার জন্য নয়; বরং শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য। মহান আল্লাহ্‌র নিকটে সঊদী আরব বা আমেরিকার অধিবাসীরা সম্মানিত নয়; বরং সমগ্র মাবন জাতি তথা সকল আদম সন্তানই সম্মানিত। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً. 'আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমার সৃষ্টিরাজির মধ্যে তাদেরকে অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি' *(বনী ইসরাইল ১৭/৭০)*।

এখানে আল্লাহ মর্যাদার কথা বলতে গিয়ে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী কিংবা কোন বিশেষ অঞ্চল, ভাষা বা বর্ণের মানুষদের কথা না বলে সকল বনু আদমের কথা উল্লেখ করেছেন। ইসলামী বিশ্বাসের এই উদার বহিঃপ্রকাশ মানুষের মধ্যে রক্ত, বর্ণ, ভাষা, গোত্র ও ভৌগলিক সীমারেখার সকল ব্যবধান চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে মানব জাতিকে এক পরিবারে পরিণত করেছে।

বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে বিদায় হজের ময়দানে মহানবী (ছাঃ) বলেন, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا، فِيْ شَهْرِكُمْ هذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هذَا. 'তোমাদের একের রক্ত (জীবন) ও সম্পদ তোমাদের অপরের প্রতি (সকল দিনে, সকল মাসে, সকল স্থানে) হারাম- যেভাবে এই দিনে, এই মাসে, এই শহরে হারাম'।[৫] এই মর্মে রাসূল (ছাঃ) আরও বেশ কিছু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমন, হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একটি হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَيَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَّ يَرْحَمُ النَّاسَ. 'আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করেন না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না'।[৬] আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. 'আল্লাহ্‌র কসম! সে ঈমানদার নয়। আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়। আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে রাসূল (ছাঃ)! সে কে? তিনি বললেন, যার

৩. *আহমাদ, হা/২৩৫৩৬।*
৪. *তিরমিযী হা/৩৯৫৬; আহমাদ হা/৮৯৭০, হাদীছ হাসান।*
৫. *মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২৫৫৫।*
৬. *মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত, হা/৪৯৪৭; আল-আদাবুল মুফরাদ, তাহকীক : শায়খ আলবানী, হা/৯৬।*

প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হ'তে নিরাপদ নয়'।[৭] অন্য হাদীছে এসেছে, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. 'সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়'।[৮]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে উত্তম সাথী সে, যে তার সঙ্গী-সাথীর নিকট উত্তম। আর আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে উত্তম প্রতিবেশী সে, যে তার পড়শীর নিকট উত্তম'।[৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُّحِبَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهُ إِذَا حَدَّثَ، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ. وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ.

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসতে চায় অথবা চায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) তাকে ভালবাসুক, সে যেন কথা বলার সময় সত্য কথা বলে, আমানত রাখা হ'লে তা আদায় করে এবং প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ করে'।[১০]

عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِىْ أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِىِّ؟ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُوْدِىِّ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

'মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ)-এর জন্য তার পরিবারে ছাগল যবেহ করা হ'ল। তিনি এসে বললেন, তোমরা কি আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীকে হাদিয়া স্বরূপ কিছু পাঠিয়েছ? তোমরা কি আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীকে হাদিয়া স্বরূপ কিছু পাঠিয়েছ? আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমাকে জিবরীল (আঃ) প্রতিবেশীর ব্যাপারে সর্বদা উপদেশ দিয়ে থাকেন। এমনকি আমার এ ধারণা সৃষ্টি হ'ল যে, তিনি তাকে ওয়ারিছ বানিয়ে ছাড়বেন'।[১১]

অন্য এক হাদীছে তিনি বলেন, إِرْحَمُوْا مَنْ فِىْ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَّنْ فِىْ السَّمَاءِ. 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, তাহ'লে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন'।[১২]

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ، وَأَنْزَلَ فِى الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا، خَشْيَةَ أَنْ تُصِيْبَهُ.

'আল্লাহ তা'আলা দয়াকে ১০০টি অংশে বিভক্ত করেছেন। অতঃপর তাঁর নিকটে ৯৯টি অংশ রেখে দিয়েছেন এবং পৃথিবীতে মাত্র একটি অংশ দিয়েছেন। সেই অংশ থেকেই সৃষ্টজীব পরস্পর দয়া করে। এমনকি পদদলিত হওয়ার ভয়ে ঘোড়া সন্তান থেকে তার ক্ষুরকে উঁচু করে রাখে'।[১৩]

শুধু এখানেই শেষ নয়, পৃথিবীতে আল্লাহ্র বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে তাঁর পক্ষ থেকে এক লক্ষ চব্বিশ হাযার পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন।[১৪] কিন্তু তাঁদের সকলের পরিচয় জানা যায় না। তাই ইসলাম ধর্মে অন্য ধর্মের প্রবর্তকদের নাম শ্রদ্ধাভরে নেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সকল নবী-রাসূলের উপর বিশ্বাস করা ঈমানের পরিচায়ক। হাদীছে জিবরীলে ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَنْ تُؤْمِنَ بَاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. 'আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, আসমানী কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস করা'।[১৫] আর এটি বিশ্বভ্রাতৃত্বের অন্যতম একটি নিদর্শন। শুধু পয়গম্বর নয়, অন্যান্য ধর্মে যেসব দেব-দেবী আছে যাদেরকে ইসলাম সমর্থন করে না, তাঁদের সম্বন্ধেও কোন কটু বাক্য বলা ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ কোন মুসলমান কোন অমুসলমানের উপাস্যকে গালি দিলে

৭. *মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত, হা/৪৯৬২।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৩।*
৯. *তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৪৯৮৭; ছহীহ তারগীব হা/২৫৬৮, সনদ ছহীহ।*
১০. *বায়হাকী; মিশকাত হা/৪৯৯০, হাদীছ হাসান।*
১১. *তিরমিযী হা/১৯৪৩, প্রতিবেশীর অধিকার' অনুচ্ছেদ; আবূদাঊদ হা/৫১৫২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়; আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/১২৮, 'ইহুদী প্রতিবেশী' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ।*
১২. *আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত, হা/৪৯৬৯।*
১৩. *বুখারী হা/৬০০০; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০০।*
১৪. *আহমাদ, তাবারাণী, মিশকাত হা/৫৭৩৭; সিলসিলা ছহীহা হা/২৬৬৮।*
১৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/২।*

সেও প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে মুসলমানের উপাস্য তথা আল্লাহ্‌কে গালি দিবে। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَسُبُّوْا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ فَيَسُبُّوْا اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ. ‘তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে। তাহ’লে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে’ *(আন‘আম ৬/১০৮)*। সুতরাং অমুসলমান কর্তৃক আল্লাহকে গালি দেওয়ার বিষয়ে ঐ মুসলমানই দায়ী। তাছাড়া একজন মুসলামন দৈনন্দিন ছালাতের শেষ পর্যায়ে ডানে-বামে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে তার চারপাশে অবস্থিত সকল প্রকার জীবের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে শান্তি ও কল্যাণের প্রার্থনা করে থাকে। আপন প্রার্থনায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মঙ্গল কামনার মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্বের এই চূড়ান্ত নিদর্শন ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই ইসলাম শুধু মুসলমানদের ধর্ম নয়, মানবজাতির ধর্ম এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) শুধু মুসলমানদের নবী নন, সমগ্র মানবজাতির নবী তথা বিশ্বনবী।

ইসলাম মনে করে মানুষের বংশ-গোত্র, ধন-দৌলত কোন কিছুই মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি মানুষ মানবতার বিরাট বাগিচার এক একটি ফল। আর এটাই সত্যিকারের বিশ্বভ্রাতৃত্ব।

[চলবে]

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ‘আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী’-এর প্রতিভাদীপ্ত এক ঝাঁক মেধাবী ছাত্র কর্তৃক রচিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা সম্পাদিত দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও সর্বমহলে সমাদৃত **‘দিশারী’** দাখিল প্রশ্নপত্র সাজেশান্স ২০১০ বিজ্ঞান বিভাগ সহ বৃহত্তর কলেবরে বের হয়েছে।

আপনার কপির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

যোগাযোগ

“দিশারী” দাখিল সাজেশান্স প্রনয়ণ কমিটি
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭৩৬-৮৪৫২৫০
০১৭১০-৬৪৯৮৯৭
০১১৯৬-১৩৮২০০

জুম‘আর কতিপয় বিধান

*মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন**

ইসলামে বাৎসরিক ঈদ হচ্ছে দু’টি- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। আর সাপ্তাহিক ঈদ হচ্ছে জুম‘আর দিন। এছাড়া অন্য কোন ঈদ ইসলামে স্বীকৃত নয়। আলোচ্য নিবন্ধে জুম‘আর কতিপয় বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হ’ল-

আল্লাহ তা‘আলা জুম‘আর ছালাতের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ...

‘হে ঈমানদারগণ! জুম‘আর দিনে যখন তোমাদেরকে ছালাতের জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা (ছালাতের মাধ্যমে) আল্লাহ্‌র স্মরণের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা তা উপলব্ধি কর। অতঃপর যখন ছালাত শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা (কাজ-কর্মের জন্য) পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো...’ *(জুম‘আহ ৬২/৯-১০)*।

জুম‘আর ছালাত কাদের উপর ফরয?

চার শ্রেণীর লোক ব্যতীত প্রত্যেক মুসলিমের উপরে জুম‘আর ছালাত ফরয করা হয়েছে। এ চার শ্রেণীর ব্যক্তি হচ্ছে- কৃত দাস-দাসী, নাবালেগ সন্তান, রোগী, মহিলা ও মুসাফির। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ إِلاَّ عَلَى أَرْبَعَةٍ عَبْدٍ مَمْلُوْكٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيْضٍ.

‘চার ব্যক্তি ব্যতীত প্রত্যেক মুসলিমের উপরে জুম‘আর ছালাত জামা‘আতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব; (তারা হচ্ছে) কৃত দাস-দাসী, মহিলা, নাবালেগ সন্তান ও রোগী’।[১]

জুম‘আর দিনে গোসল করার হুকুম :

জুম‘আর ছালাতের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। জুম‘আর দিনে গোসল করা এবং জুম‘আর ছালাতের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিনে গোসল করবে (তার জন্য) গোসল করাই উত্তম’।[২]

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এম. এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; দাঈ, সঊদী ধর্ম মন্ত্রণালয়।*

১. *ছহীহ আবূদাঊদ হা/১০৬৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৩১১১; মিশকাত হা/১৩৭৭।*
২. *ছহীহ তিরমিযী হা/৪৯৭; ছহীহ নাসাঈ হা/১৩৮০।*

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করবে, সাধ্যমত পবিত্রতা অর্জন করবে (নখ, গোঁফ, নিম্নাংশের চুল ইত্যাদি পরিষ্কার করবে) এবং তার নিজস্ব তেল ব্যবহার করবে অথবা তার গৃহে থাকা সুগন্ধি ব্যবহার করবে। অতঃপর বের হবে এবং বসে থাকা দু'মুছল্লীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাবে না। অতঃপর তার পক্ষে যত রাক'আত সম্ভব ছালাত আদায় করবে। এরপর যখন ইমাম ছাহেব খুৎবা প্রদান করবে তখন চুপ থাকবে, তার জন্য তার এ জুম'আ থেকে পরবর্তী জুম'আর মাঝের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে'।[৩]

এ হাদীছ থেকে বুঝা গেল যে, জুম'আর দিনে গোসল করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত এবং এর ফলে পাপ সমূহ ক্ষমা হয়ে যাবে। তবে কবীরা গোনাহ নয়।

কবীরা বা বড় গুনাহ তওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, 'তোমোদেরকে যেসব বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে, তোমরা যদি সেগুলো থেকে বেঁচে থাকো তাহ'লে আমি তোমাদের ছোট ছোট গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থান দান করব' *(নিসা ৪/৩১)*।

আর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মাঝের সময়ে সংঘটিত গুনাহের জন্য প্রতি ওয়াক্তের ছালাত, এক জুম'আ হ'তে অন্য জুম'আ এবং এক রামাযান হ'তে আরেক রামাযানের মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত গুনাহের জন্য রামাযানের ছাওম কাফ্ফারাহ স্বরূপ; যদি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়'।[৪]

দৈনন্দিন ব্যবহৃত পোষাক ব্যতীত জুম'আর জন্য নতুন বা পৃথক পোষাক পরিধান করা মুস্তাহাব (সুন্নাত)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যদি জুম'আর দিনে তার কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত দু'টি কাপড় ব্যতীত অন্য দু'টি কাপড় ব্যবহার করতে সক্ষম হয় তাহ'লে সে যেন তা ব্যবহার করে (এতে কোন সমস্যা নেই)'।[৫]

জুম'আর ছালাতের জন্য কতজন মুছল্লীর উপস্থিতি যরূরী?

ইমামের সাথে মাত্র একজন মুছল্লী থাকলে জুম'আর ছালাত আদায় করা যাবে। জুম'আর ছালাত অন্যান্য ফরয ছালাতের ন্যায় ফরয। অতএব সর্বনিম্ন যতজনে জামা'আত কায়েম হয় ততজন উপস্থিত হ'লেই জামা'আত করা যাবে। আর ইমামের সাথে সর্বনিম্ন একজন থাকলেই জামা'আতের ছওয়াব অর্জিত হয়। এর চেয়ে বেশী শর্ত আরোপের এবং সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ছহীহ কোন দলীল নেই।

আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, সংখ্যা নির্ধারণে পনেরটি মত উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু কোন মতের পক্ষেই ছহীহ দলীল নেই। যদি দু'জন মুছল্লী উপস্থিত থাকে তাহ'লে একজন খুৎবা দিবে এবং আরেকজন হবে শ্রোতা এবং এ দু'জনে জামা'আত কায়েম করবে। কা'ব ইবনু মালেক (রহঃ) বলেছেন, সর্বপ্রথম যিনি আমাদের নিয়ে জুম'আর ছালাত আদায় করেন তিনি হচ্ছেন আস'আদ ইবনু যুরারাহ ...। জিজ্ঞেস করা হ'ল সে সময় আপনারা কতজন ছিলেন তিনি উত্তরে বললেন, আমরা চল্লিশজন ছিলাম।[৬] উক্ত আছারটিতে সেই জুম'আর ছালাতে কতজন উপস্থিত ছিল তা বুঝানো হয়েছে। কিন্তু চল্লিশজনই হ'তে হবে তা বলা হয়নি।

উল্লেখ্য, জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, 'সুন্নাত হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক চল্লিশজন অথবা এর চেয়ে বেশী সংখ্যক মুছল্লী উপস্থিত হ'লে জুম'আহ, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর আদায় করতে হবে'। কিন্তু আছারটি নিতান্তই যঈফ।[৭]

জুম'আর ছালাতের জন্য আগেভাগে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার ফযীলত :

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে ফরয গোসল করে প্রথমে মসজিদে উপস্থিত হ'ল সে যেন একটি উট ছাদাক্বা করল। এরপর যে ব্যক্তি মসজিদে আসল সে যেন একটি গরু ছাদাক্বা করল। এরপর যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল সে যেন একটি ছাগল ছাদাক্বা করল। এরপর যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল সে যেন একটি মুরগী ছাদাক্বা করল। অতঃপর যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল সে যেন একটি ডিম ছাদাক্বা করল। অতঃপর যখন ইমাম খুৎবার জন্য বেরিয়ে আসেন তখন ফেরেশতারা উপদেশ শ্রবণ করা শুরু করেন'।[৮]

জুম'আর দিন ও জুম'আর রাতের ফযীলত :

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে দিনগুলোতে সূর্য উদিত হয় সেগুলোর মধ্যে জুম'আর দিন হচ্ছে সর্বোত্তম। কারণ এ দিনেই আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল, এ দিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিল, এ দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছিল। আবার এ দিনেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে'।[৯]

---

৩. *বুখারী হা/৮৮২; আহমাদ হা/২৩১৯৮; মিশকাত হা/১৩৮১।*
৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৪।*
৫. *ছহীহ আবূদাউদ হা/১০৭৮; ছহীহ জামেউছ ছাগীর হা/৫৬৩৫; মিশকাত হা/১৩৮৯।*
৬. *ছহীহ আবূদাউদ হা/১০৬৯; ইরওয়াউল গালীল হা/৬০০; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/১৭২৪।*
৭. *দারাকুৎনী, ইরওয়াউল গালীল হা/৬০৩।*
৮. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮৪।*
৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৬।*

www.at-tahreek.com

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে মুসলিম ব্যক্তি জুম'আর দিনে অথবা জুম'আর রাতে মারা যাবে আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরের ফেতনা থেকে রক্ষা করবেন'।[১০] (কিন্তু সে ব্যক্তিকে সত্যিকারের মুসলিম হ'তে হবে)।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুম'আর দিন। এ দিনেই আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনেই তাঁর রূহ কবয করা হয়েছে, এ দিনেই সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং এ দিনেই সকলে বেহুঁশ হয়ে যাবে। এ দিনে তোমরা আমার প্রতি বেশী বেশী দুরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের পাঠকৃত দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি মাটি হয়ে যাবেন এমতাবস্থায় আপনার প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে পাঠকৃত দুরূদ কিভাবে পেশ করা হবে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যমীনের জন্য নবীগণের শরীরগুলো খেয়ে ফেলাকে হারাম করে দিয়েছেন'।[১১]

জুম'আর দিনে বা রাতে সূরা কাহফ পাঠের ফযীলত :

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহফ পাঠ করবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা দু'জুম'আর মধ্যবর্তী সময়কে আলোকিত করে দিবেন'।[১২] অন্য হাদীছে জুম'আর রাতেও সূরা কাহফ পাঠ করার ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে।[১৩]

জুম'আর দিনে দো'আ কবূলের সময় :

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর দিনের কথা উল্লেখ করে বললেন, 'এ দিনে এমন একটি সময় আছে যে, কোন মুসলিম বান্দার ভাগ্যে যদি সময়টি মিলে যায় এমতাবস্থায় যে, সে ছালাত আদায় করছে আর আল্লাহ্র নিকট কিছু প্রার্থনা করছে তাহ'লে আল্লাহ্ তাকে তাই প্রদান করবেন। তিনি তাঁর হাতের ইঙ্গিতে বুঝালেন যে, সময়টি খুবই সামান্য'।[১৪]

জুম'আর খুৎবা চলা অবস্থায় চুপ থাকার ফযীলত:

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তুমি যদি জুম'আর দিন ইমাম কর্তৃক খুৎবা দেয়ার সময় তোমার কোন সাথীকে বল চুপ করো, তাহ'লে তুমি ত্রুটি করলে'।[১৫]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযূ করে জুম'আর ছালাত আদায় করার জন্য এসে মনোযোগের সাথে খুৎবা শ্রবণ করল এবং চুপ থাকল তার এ জুম'আ থেকে পরের জুম'আ পর্যন্ত সংঘটিত গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং এর সাথে অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি খুৎবা চলা অবস্থায় পাথর বা কোন বস্তু স্পর্শ করবে সে ত্রুটিকারী হিসাবে গণ্য হ'ল'।[১৬]

উক্ত হাদীছ দু'টি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, জুম'আর খুৎবা চলাকালীন সময় কথা বলা যাবে না, কোন কিছু নাড়াচাড়া করা যাবে না এবং কাউকে চুপ করতেও বলা যাবে না এবং কারো দিকে ইশারাও করা যাবে না।

খুৎবা চলা অবস্থায় দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার বিধান :

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) জুম'আর দিনে খুৎবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে এসে বসে পড়লে তিনি তাকে বললেন, তুমি কি ছালাত আদায় করেছ? সে ব্যক্তি বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি দাঁড়াও এবং দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর'।[১৭]

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে আরো বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন জুম'আর দিনে খুৎবা দিচ্ছিলেন তখন সুলাইক আল-গাতফানী (রাঃ) এসে বসে পড়লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, 'হে সুলাইক! দাঁড়াও, সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। অতঃপর বললেন, জুম'আর দিনে তোমাদের কেউ যখন ইমাম কর্তৃক খুৎবা দেয়ার সময় মসজিদে আসবে তখন সে যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে এবং দু'রাক'আত আদায়ে যেন সংক্ষিপ্ত করে'।[১৮]

এখানে একটি বিষয় ব্যাখ্যার দাবী রাখে যে, আমাদের সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, খুৎবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। অতএব খুৎবা চলাকালীন সময়ে কোন প্রকার ছালাত আদায় করা যাবে না। উপরোক্ত হাদীছের উপর আমল না করার বাহানা স্বরূপ এমন কথা বলা হয়। প্রশ্ন হ'ল, আমরা কার নিকট থেকে জেনেছি যে, খুৎবা শোনা ওয়াজিব? খুৎবা চলা অবস্থায় চুপ থাকা এবং তা শ্রবণ করার শিক্ষা পেয়েছি নবী করীম (ছাঃ) থেকেই। তাহ'লে বিষয়টিকে সহজভাবে নিয়ে যদি বলি যে, যিনি খুৎবা চলা অবস্থায় চুপ থাকতে বলেছেন এবং খুৎবা শ্রবণ করতে বলেছেন। তিনিই তো আবার খুৎবা চলা অবস্থায় শত শত

১০. *তিরমিযী হা/১০৭৪; ছহীহ তিরমিযী হা/১০৭৪; মিশকাত হা/১৩৬৭।*
১১. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/১০৪৭; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১০৮৫; ছহীহ নাসাঈ হা/১৩৭৪; মিশকাত হা/১৩৬১।*
১২. *বায়হাক্বী, হাকিম, ছহীহ জামে'উছ ছাগীর হা/৬৪৭০, ৬৪৭১; মিশকাত হা/২১৭৫।*
১৩. *ছহীহুত তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/৭৩৬।*
১৪. *বুখারী হা/৯৩৫; মুসলিম হা/৮৫২।*
১৫. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮৫।*
১৬. *মুসলিম হা/৮৫৭।*
১৭. *বুখারী হা/৯৩০, ৯৩১, ১১৭০; মুসলিম হা/৮৭৫।*
১৮. *মুসলিম হা/৮৭৫; মিশকাত হা/১৪১১।*

www.at-tahreek.com

ছাহাবীর সম্মুখে বসে পড়ার পরেও এক ছাহাবীকে বসা থেকে উঠিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব এখানে আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, খুৎবা চলা অবস্থায় কার ক্ষেত্রে কথা বলা নিষেধ এবং চুপ থাকা ও খুৎবা শ্রবণ করা যরূরী? যিনি খুৎবা চলা অবস্থায় অথবা তার পূর্বেই মসজিদে উপস্থিত হয়েছেন তার জন্যই যরূরী। আর যিনি খুৎবা চলা অবস্থায় মসজিদে আসবেন তার জন্য দু'রাক'আত সংক্ষিপ্ত ছালাতের সময় বাদ দিয়ে বাকী সময় খুৎবা শ্রবণ করা যরূরী। যিনি মসজিদে আসেননি তার জন্য এটি যরূরী নয়। খুৎবা শ্রবণ করা এমন ধরনের ওয়াজিব বা যরূরী বিষয় নয় যে, খুৎবা না শোনার জন্য গুনাহ্গার হবেন বা ওয়াজিব ছেড়ে দেয়ার কারণে তাকে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে। তাছাড়া কোন ছহীহ হাদীছে বলা হয়নি যে, খুৎবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। তবে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ হাদীছের ভাষার দিকে লক্ষ্য করে ওয়াজিব আখ্যা দিয়েছেন। মোটকথা খুৎবা চলা অবস্থায় চুপ থেকে খুৎবা শ্রবণ করতে যিনি বলেছেন, তিনিই খুৎবা চলাকালীন সময়ে সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি বসে পড়ার পরেও তিনি উঠিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব খুৎবা চলাকালীন সময়ে এ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার গুরুত্ব অত্যধিক।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, যোহরের চার রাক'আতের স্থলে জুম'আর ছালাত দু'রাক'আত আর খুৎবাকে অবশিষ্ট দু'রাক'আতের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এ কারণে খুৎবা ছালাতেরই অংশ। অতএব খুৎবা চলা অবস্থায় যেমন কোন কথা বলা যাবে না, তেমনিভাবে কোন ছালাতও আদায় করা যাবে না। যারা এ কথা বলেন, তারা আসলে জুম'আর ছালাত সংক্রান্ত নবী করীম (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ সম্পর্কে অজ্ঞ। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ প্রমাণ করছে যে, জুম'আর ছালাতের মধ্যে কোন প্রকার অপূর্ণতা নেই; বরং দু'রাক'আতই হচ্ছে জুম'আর পূর্ণাঙ্গ ছালাত। যেমন-

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ভাষায় 'সফরের ছালাত দু'রাক'আত, ঈদুল আযহার ছালাত দু'রাক'আত, ঈদুল ফিতরের ছালাত দু'রাক'আত এবং জুম'আর ছালাত দু'রাক'আত পূর্ণাঙ্গ অসম্পূর্ণ নয়'।[১৯]

এ হাদীছটি প্রমাণ করে যে, জুম'আর ছালাতকে দু'রাক'আত হিসাবেই পূর্ণাঙ্গ করে ফরয করা হয়েছে। আসলে একটি মতকে সাব্যস্ত করতে গিয়ে কয়েকটি হাদীছকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, যে হাদীছে খুৎবাকে দু'রাক'আতের পরিবর্তে উল্লেখ করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন। আরো বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি খুৎবা পাবে না সে যেন চার রাক'আত ছালাত আদায় করে। কিন্তু এটি ভিত্তিহীন।[২০] আয়েশা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বলা হয়ে থাকে যে, খুৎবার কারণে জুম'আর ছালাত দু'রাক'আত করা হয়েছে। এটাও মিথ্যা বর্ণনা। এর কোন সনদই পাওয়া যায় না।[২১]

জুম'আর ছালাতের রাক'আত সংখ্যা :

জুম'আর ফরয ছালাত দু'রাক'আত। জুম'আর ফরয ছালাতের পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নাত নেই। কিন্তু আমাদের দেশে বাংলায় বয়ান রাখার পরে খত্বীব বা ইমাম ছাহেবরা বলেন, জুম'আর পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত আদায় করুন। আবার কোন কোন মসজিদের খত্বীব ছাহেব আরবী ভাষাতেই বলেন, 'ক্বাবলাল জুম'আহ' চার রাক'আত সুন্নাত আদায় করুন। তারা কিসের ভিত্তিতে মুছল্লীদের এ নির্দেশ প্রদান করেন?

যে হাদীছের আলোকে জুম'আর পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে, তা জাল। আর জাল হাদীছ দ্বারা সুন্নাত সাব্যস্ত হবে না। যেমন-

كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعاً لا يفصل في شيء منهن.

নবী (ছাঃ) জুম'আর পূর্বে চার রাক'আত এবং জুম'আর পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন, উক্ত চার রাক'আতের মাঝে পৃথক করতেন না।

শায়খ আলবানী বলেন, হাদীছটি বাতিল।[২২] 'হিদায়া' গ্রন্থের হাদীছ সমূহের তাখরীজকারী ইমাম যায়লা'ঈ হানাফী এবং হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, হাদীছটি খুবই দুর্বল।[২৩] তবে জুম'আর পূর্বে খুৎবা শুরু হয়ে গেলে শুধুমাত্র 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' হিসাবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে, আর যদি খুৎবা শুরু

১৯. *আহমাদ হা/২৫৯; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১০৬৩।*
২০. *য'ঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ হা/৫২০২।*
২১. *ইরওয়াউল গালীল হা/৩৭৩।*
২২. *যঈফ জামে'উছ ছাগীর হা/৪৫৫০; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১১২৯; সিলসিলা যঈফা হা/১০০১/হা/১০১৬।*
২৩. *নাসবুর রায়া ২/২০৬ পৃঃ; আত-তালখীছ ৪/২২৬ পৃঃ।*

www.at-tahreek.com

হওয়ার আরো আগে এসে থাকে তাহ'লে প্রথমে দু'রাক'আত 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' আদায় করার পরে খুৎবা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যত ইচ্ছা নফল ছালাত আদায় করবে।[২৪]

ইবনুল মুনযির বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে আমরা বর্ণনা করেছি যে, তিনি জুম'আর ছালাতের পূর্বে বারো রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। আর ইবনু আব্বাস (রাঃ) আট রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, তিনি চার রাক'আত আদায় করতেন। জুম'আর ছালাতের পূর্বে নফল ছালাতের রাক'আতের ক্ষেত্রে এরূপ বিভিন্নতা প্রমাণ করে যে, জুম'আর পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নাত ছিল না। বরং তাহিয়্যাতুল মসজিদ ছাড়া অনির্দিষ্ট সংখ্যক ছালাত আদায় করার অনুমোদন ছিল।[২৫]

উল্লেখ্য, জুম'আর ছালাতের পূর্বে বাড়ীতে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা মিথ্যা ও বানোয়াট। এর সনদে ইসহাক্ব আল-আসওয়ারী বাছরী নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছে। তার সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেন, সে মিথ্যুক ও হাদীছ জালকারী। শায়খ আলবানী বলেন, এ মিথ্যুক এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছে *(আল-উজূবাতুন নাফি'আহ)*।

জুম'আর ফরয ছালাত আদায় করার পরে দু'রাক'আত অথবা চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করবে।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন জুম'আর ছালাত আদায় করবে সে যেন জুম'আর পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করে'।[২৬] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহরের পূর্বে দু'রাক'আত, যোহরের পরে দু'রাক'আত, মাগরিবের পরে তাঁর গৃহে দু'রাক'আত এবং এশার পরে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। আর জুম'আর পরে ঘরে না ফিরা পর্যন্ত কোন ছালাত আদায় করতেন না। অতঃপর (ঘরে ফিরে) দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন।[২৭]

আত্বা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) যখন মক্কায় জুম'আর ছালাত আদায় করতেন তখন সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন, অতঃপর আবারো এগিয়ে গিয়ে চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। আর যখন মদীনায় থাকতেন তখন জুম'আর ছালাত আদায় করার পর বাড়ীতে ফিরে এসে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। তিনি মসজিদে ছালাত আদায় করতেন না। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপই করতেন।[২৮] ইমাম তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে আত্বা বলেন, আমি ইবনু ওমর (রাঃ)-কে জুম'আর পরে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি চার রাক'আত ছালাত আদায় করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জুম'আর পরে দু'রাক'আত[২৯] অতঃপর চার রাক'আতও আদায় করা যায়।[৩০]

জুম'আর ছালাতের ক্বিরাআত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর ছালাতের প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা গাশিয়া পাঠ করতেন।[৩১] কখনো কখনো সূরা জুম'আ ও মুনাফিকূনও পড়তেন।[৩২]

জুম'আর ছালাত ত্যাগ করা মহা অপরাধ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অলসতা করে পরপর তিনটি জুম'আহ ছেড়ে দিবে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন'।[৩৩]

অন্য হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোন প্রকার ওযর ছাড়াই তিনটি জুম'আহ ছেড়ে দিবে তার নাম মুনাফিকদের দফতরে লিখা হবে'।[৩৪]

জুম'আর ছালাত ছুটে গেলে করণীয় :

জুম'আর ছালাত ছুটে গেলে যোহরের চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'যার জুম'আর দু'রাক'আত ছুটে যাবে সে যেন চার রাক'আত যোহরের ছালাত আদায় করে'।[৩৫]

ঈদের দিনে জুম'আর ছালাতের বিধান :

ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, জুম'আর দিনের সাথে যদি ঈদের দিন মিলে যায় তাহ'লে জুম'আর ছালাতে উপস্থিত হওয়া ইচ্ছাধীন। মু'আবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান (রাঃ) যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন,

---

২৪. *বুখারী হা/৮৮৩; আহমাদ হা/২৩১৯৮।*
২৫. *বিস্তারিত দ্রঃ শায়খ আলবানী রচিত 'আল-উজূবাতুন নাফি'আহ'।*
২৬. *মুসলিম হা/৮৮১; তিরমিযী হা/৫২৩; নাসাঈ হা/১৪২৬; আবূ দাউদ হা/১১৩১।*
২৭. *বুখারী হা/৯৩৭; মুসলিম হা/৭২৯।*
২৮. *আবূদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১১৭৮।*
২৯. *আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৮৭।*
৩০. *মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৬।*
৩১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৮৪০।*
৩২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৮৩৯।*
৩৩. *আবূদাঊদ হা/১০৫২; নাসাঈ হা/১৩৬৯; হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৭১।*
৩৪. *ছহীহ জামে'উছ ছাগীর হা/৬১৪৪; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৭২৯।*
৩৫. *তামামুল মিন্নাহ্ হা/৩৪০, সনদ ছহীহ।*

www.at-tahreek.com

أَشَهِدْتَّ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيْدَيْنِ اجْتَمَعَا فِيْ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيْدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُّصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ.

‘আপনি কি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এমন কোন দু’ঈদে উপস্থিত ছিলেন যে দু’ঈদ একদিনে একত্রিত হয়ে গিয়েছিল? তিনি (যায়েদ (রাঃ)) বললেন, হ্যাঁ। মু‘আবিয়া (রাঃ) বললেন, তিনি সেদিন কী করেছেন? যায়েদ (রাঃ) বললেন, তিনি ঈদের ছালাত আদায় করেন, অতঃপর জুম‘আর ছালাতকে ঐচ্ছিক করে দিয়ে বলেন, যে (জুম‘আর) ছালাত আদায় করতে চায়, সে (জুম‘আর) ছালাত আদায় করতে পারে’।[৩৬]

জুম‘আর দিন ফজরের ছালাতের সুন্নাতী ক্বিরাআত :

জুম‘আর দিনে ফজরের ছালাতে প্রথম রাক‘আতে সূরা সাজদাহ ও দ্বিতীয় রাক‘আতে সূরা দাহ্‌র পাঠ করা সুন্নাত। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) জুম‘আর দিনে ফজরের ছালাতে সূরা ‘তানযীল আস-সাজদাহ’ এবং সূরা ‘হাল আতা আলাল ইনসানে হীনুম মিনাদ দাহ্‌রে’ পাঠ করতেন।[৩৭]

জুম‘আর সাথে সংশ্লিষ্ট বিদ‘আত সমূহ :

১। তিন স্তর বিশিষ্ট মিম্বরের চেয়ে বেশী স্তর বিশিষ্ট মিম্বর তৈরি করা।

২। জুম‘আর খুৎবা চলাকালীন সময়ে দু’রাক‘আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় না করা।

৩। জুম‘আর ছালাতের পূর্বে ক্বাবলাল জুম‘আহ নামে চার রাক‘আত সুন্নাত আদায় করা।

৪। জুম‘আর ছালাত আদায় করার পরে যোহরের ছালাত আদায় করা।

৫। জুম‘আর দিন হওয়ার কারণে সে দিনে ভ্রমণ ত্যাগ করা। অর্থাৎ সফর করা থেকে বিরত থাকা।

৬। জুম‘আর দিন উপলক্ষে শরী‘আত বিরোধী কোন পোষাক পরিধান করা। যেমন পুরুষদের স্বর্ণ ব্যবহার করা এবং রেশমী পোষাক পরিধান করা।

৭। জুম‘আর দিন উপলক্ষে ইমাম বা খত্বীব ছাহেব কর্তৃক খুৎবার পূর্বে বা জুম‘আর ছালাতের পূর্বে কালো বা যে কোন রঙের পাগড়ী ব্যবহার করা। পাগড়ী পরে জুম‘আর উল্লেখ্য যে, খুৎবা প্রদান বা ছালাত আদায় করার ফযীলত সম্পর্কে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সবই বানোয়াট। যেমন ‘পাগড়ী পরে এক জুম‘আ ছালাত আদায় করা বিনা পাগড়ীতে সত্তর জুম‘আ আদায় করার সমতুল্য’।[৩৮]

৯। জুম‘আর খুৎবা চলাকালীন সময়ে কেউ যাতে ছালাত আদায় না করে এ উদ্দেশ্যে লাল বাতি জ্বালিয়ে রাখা।

১০। জুম‘আর দিনকে নির্দিষ্ট করে পিতা-মাতা বা অন্য কারো কবর যিয়ারত করা।

১১। নির্দিষ্ট করে শুধুমাত্র জুম‘আর দিনে ছাওম রাখা।

১২। জুম‘আর মূল খুৎবার পূর্বে বয়ান করা। এরূপ পদ্ধতির কোন নযীর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবা সহ পরের যুগের সালফে ছালেহীনের মাঝে ছিল না। এ পদ্ধতি নবাবিস্কৃত, যা ভারত উপমহাদেশেই প্রচলিত রয়েছে। বরং খুৎবার ভূমিকা আরবী ভাষায় শুরু করে পরক্ষণেই উপস্থিত মুছল্লীদের ভাষায় সমসাময়িক বিষয় সহ যে কোন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক ইসলামী বিষয়ে বক্তব্য দেয়াই হচ্ছে প্রকৃত ইসলামী রীতি। অতঃপর দ্বিতীয় খুৎবার ভূমিকা আরবীতে দেয়ার পরেও কিছু বক্তব্য রাখা যায়। এরপর খুৎবা সমাপ্ত করবে।

১৩। দ্বিতীয় আযান খত্বীব ছাহেবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে দেয়া।

পরিশেষে বলব, যে কোন ইবাদত কবুল ও মঞ্জুর হওয়ার জন্য তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত মোতাবেক হওয়া আবশ্যক। তেমনি জুম‘আর ছালাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটাও হাদীছ মোতাবেক হ’তে হবে। অন্যথা তা বাতিল হবে। আল্লাহ আমাদেরকে হাদীছ মোতাবেক আমল করার তাওফীক্ব দিন- আমীন!

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ‘আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স’-এর প্রতিভাদীপ্ত এক ঝাঁক মেধাবী ছাত্র কর্তৃক রচিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা সম্পাদিত দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও সর্বমহলে সমাদৃত অষ্টম শ্রেণীর J.D.C প্রশ্নপত্র সাজেশন্স **‘দিশারী-২০১০’** বের হয়েছে।

আপনার কপির জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ

‘দিশারী’ J.D.C সাজেশান্স প্রণয়ন কমিটি
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৯৩৭-০০৮১৪৩;
০১৭৪৫-৪৩২৫৪০;
০১৭৩৮-৪৭৫৩২৪;
০১৭৩৬-৮৪৫৮২৩।

৩৬. *হাদীছ ছহীহ, ছহীহ আবূদাঊদ হা/১০৭০; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৩১০।*
৩৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩৮।*
৩৮. *যঈফ জামে‘উছ ছাগীর হা/৩৫২০; য‘ঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ হা/১২৭।*

পিতা-মাতার উপর সন্তানের অধিকার

*ড. মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম**

পৃথিবীর প্রতিটি গৃহে প্রত্যেক ব্যক্তি সন্তান কামনা করে। সন্তানের উপস্থিতি যেমন কল্যাণ বয়ে আনে, তেমনি গৃহের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে। তাই যে গৃহে নিষ্পাপ শিশুর কল-কাকলি থাকে না, সে গৃহের শোভা ও সৌন্দর্য অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। শিশুর শোভা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে জনৈক কবি সুন্দর করে বলেছেন,

إِنَّمَا أَوْلاَدُنَا بَيْنَنَا * أَكْبَادُنَا تَمْشِيْ عَلَى الْأَرْضِ

لَوْ هَبَّتِ الرِّيْحُ عَلَى بَعْضِهِمْ * لاَمْتَنَعَتْ عَيْنِيْ عَنِ الْغُمْضِ.

সন্তানেরা মনে হয় যেন আমাদের মাঝে,
মোদেরি অন্তর মূর্ত হয়ে মাটিতে হাঁটে।
দমকা হাওয়াও বয়ে যায় যদি কোনও সাঁঝে,
ঘুম আসে না আমাদের চোখে সারাটি রাতে।

সন্তান আল্লাহ তা'আলার অগণিত নে'মতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নে'মত ও তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লামা আলূসী (রহঃ) বলেছেন, 'ধন-সম্পদ হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায় আর সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম'। পিতা-মাতার নিকট থেকে স্নেহ-মমতাসহ সন্তানের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবার অধিকার আছে। সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন, إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ. 'তোমার উপর তোমার রবের হক রয়েছে, তোমার শরীরের হক রয়েছে এবং তোমার পরিবারের হক রয়েছে। অতএব প্রত্যেককে তার অধিকার দাও'। রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে সালমান (রাঃ)-এর এ বক্তব্য পেশ করা হ'লে তিনি বলেন, 'সালমান সত্য বলেছে'।[১] কারণ মানব সন্তান পশু-পাখির মত নয় বিধায় তারা পুরোপুরি আদর-যত্ন, স্নেহ-মমতা না পেলে তাদের পক্ষে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব।

সন্তান পিতা-মাতার যৌথ ফসল। মহান আল্লাহ তা'আলার সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি মানব সন্তান পিতা-মাতার নিকট পবিত্র আমানত। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যাদের প্রচুর সম্পদ রয়েছে, কিন্তু তা ভোগ করার মতো কোন উত্তরাধিকারী নেই। তারা হাযারও চেষ্টা-সাধনা ও কামনা করে একটি সন্তান লাভ করতে পারছে না। অপরপক্ষে বহু লোক আছে যাদের যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও বহু সংখ্যক সন্তানের জনক। সন্তান লাভ করা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এক বিশেষ নে'মত। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثاً وَّيَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ- أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَّإِنَاثاً وَّيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْماً إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান' *(শূরা ৪২/৪৯-৫০)*। সন্তানের লালন, পরিপুষ্টি, সংরক্ষণ, পরিবৃদ্ধি সর্বোপরি আল্লাহ্র মর্যি মোতাবেক একজন সুন্দর মানুষ হিসাবে তার জীবন গঠন করার দায়িত্ব মাতা-পিতা উভয়ের। শিশুকে বড় করে তোলার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা পরস্পর পরিপূরক দায়িত্ব পালন করেন। উপার্জন, শাসন, নিয়ন্ত্রণ ও বহিরাঙ্গনের শ্রমসাধ্য দায়িত্ব পিতাকে পালন করতে হয়। অভ্যন্তরীণ কাজ-কর্ম, শিশুর লালন-পালন ও প্রাথমিক শিক্ষার মত মৌলিক ও ধৈর্যসাধ্য কাজগুলি সাধারণতঃ মায়ের উপর বর্তায়। শিশু নির্দোষ প্রকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে আসে। তাকে দৈহিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলে উপযুক্ত নাগরিক করার দায়িত্ব পিতা-মাতার। মহানবী (ছাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

'প্রতিটি শিশুই ফিতরাতের (ইসলাম) ওপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়'।[২]

সন্তান পিতা-মাতার যৌথ উদ্যোগের এক অনুপম উপহার। পিতা-মাতা উভয়ের নিকট সন্তানের অধিকার স্বীকৃত। আমরা সন্তানের অধিকারকে দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

(১) মাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকার।
(২) পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকার।

(১) মাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকার সমূহ :

মাতার নিকট হ'তে সন্তানের যে অধিকার স্বীকৃত তা দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত।

(ক) গর্ভকালীন বা জন্মপূর্ব অধিকার।
(খ) জন্ম পরবর্তী অধিকার।

(ক) **গর্ভকালীন অধিকার সমূহ :**

** প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী কোর্ট কলেজ।*

১. *বুখারী হা/১৮১, ১৮৪; রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১৪৯ 'ইবাদতে মধ্য পন্থা' অনুচ্ছেদ।*

২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/৯০।*

www.at-tahreek.com

গর্ভধারণ :

আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে গর্ভে আগত সন্তানকে মা অত্যন্ত আনন্দচিত্তে গ্রহণ করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বহন করবেন। এজন্য তিনি তার দেহ-মনকে সুস্থ, পূত-পবিত্র ও কলুষমুক্ত রাখবেন। সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্তে নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি সদা সতর্ক থাকবেন। সন্তানকে আপদ মনে করে বিনষ্ট করার চেষ্টা করবেন না। প্রয়োজনে নিজের সবটুকু বিলিয়ে দিবেন গর্ভস্থ সন্তানের জন্য এবং সাগ্রহে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত থাকবেন। তবেই সন্তানের প্রতি মায়ের যথাযথ কর্তব্য পালন করা হবে। মায়ের এ কঠিন দায়িত্ব সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْــنٍ. 'তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন' *(লোকমান ৩১/১৪)*।

দৈহিক গঠন :

সন্তান গর্ভে অবস্থানকালীন সময়ে মায়ের কঠোর পরিশ্রম ও বেপরোয়া চলাফেরা তার দৈহিক গঠন প্রক্রিয়ার ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। সন্তানের কল্যাণের জন্য চলাফেরার সময় তাকে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক কঠোর পরিশ্রম হ'তে বিরত থাকতে হবে। অসাবধানতার কারণে সন্তান বিকলাঙ্গ হ'তে পারে, এমনকি গর্ভপাত পর্যন্ত ও ঘটতে পারে। এ সময় পুষ্টিকর ফলমূল এবং উত্তম খাদ্য মা গ্রহণ করবেন। ফলমূল অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে ফলমূলে অধিক পরিমাণে সুগার আছে যা সহজে হজম হয় এবং এ থেকে শরীর গ্রহণ করে জীবনী শক্তি ও খাদ্যপ্রাণ। ফলমূল দেহের ক্ষয়প্রাপ্ত শক্তি যোগাতে সাহায্য করে। এ কারণে মহান আল্লাহ মারয়াম (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

وَهُزِّيْ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبــاً جَنِيًّــا– فَكُلِي وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْناً.

'তোমার দিকে খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডকে ঝুঁকিয়ে নাও, সে তোমার উপর পতিত করবে তাজা উপাদেয় খেজুর, তা তুমি খাও ও পান কর এবং নয়ন জুড়াও' *(মারয়াম ১৯/২৫-২৬)*।

আহার্য গ্রহণের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তিতা মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর। সন্তানের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে রামাযানের ছিয়াম থেকে বিরত থাকার বিষয়ে শরী'আতের অনুমোদন আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَواةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَــافِرِ وَعَــنِ الْمُرْضِعِ وَالْحُبْلَى. 'আল্লাহ তা'আলা মুসাফির হ'তে অর্ধেক ছালাত এবং মুসাফির, স্তন্যদানকারিনী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রী লোক হ'তে ছিয়াম উঠিয়ে নিয়েছেন'। অর্থাৎ ছিয়ামের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।[৩]

মানসিক গঠন :

দৈহিক কাজ-কর্মের ন্যায় এ সময় মায়ের মানসিক কর্মেরও প্রভাব সন্তানের উপর প্রতিফলিত হয়। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজেকে সংযত রেখে ঝগড়া-বিবাদ ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি হ'তে দূরে থাকা মায়ের অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) থেকে বিমুখ করতে পারে এরূপ বই-পত্র ও ধ্যান-ধারণা হ'তে মনকে পূত-পবিত্র রাখতে হবে। কেননা যাবতীয় খারাপ, অশ্লীল চিন্তা-ভাবনা পরিহার করে সৎ চিন্তা ও কুরআন-হাদীছ এবং নবীদের জীবনী পঠন ও শ্রবণ গর্ভস্থ সন্তানের সুশীল মানসিকতা গঠনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। হারাম এবং অবৈধ উপায়ে অর্জিত খাদ্যদ্রব্য গর্ভের শিশুর উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। তাই এসব হ'তে মাকে অনেক দূরে অবস্থান করতে হবে। হারাম বর্জন করে হালাল বস্তু খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে, وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُــمُ اللهُ حَــلاَلاً طَيِّبــاً. 'আল্লাহ তোমাদের যা কিছু রিযিক দান করেছেন, তার মধ্যে হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর' *(মায়েদাহ ৫/৮৮)*।

সন্তানকে সুষ্ঠু ও সুন্দর মনের একজন আদর্শবান মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার প্রধান দায়িত্ব মায়ের। মায়ের মন-মানসিকতার উপর নির্ভর করে সন্তানের মন-মানসিকতা। পৃথিবীর অধিকাংশ মা এ বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান না করার কারণে সন্তান হয় দুশ্চরিত্র। তাই একজন সুন্দর মনের সন্তান পেতে হ'লে মাকে সুন্দর পূত-পবিত্র মানসিকতাসম্পন্ন হ'তে হবে। গর্ভস্থ সন্তানের স্বার্থেই এটি প্রত্যেক মায়ের কর্তব্য এবং ভবিষ্যৎ সন্তানের এটি অধিকার। সন্তানের জন্য গর্ভবতী মাতার এসব মু'আমালাত অবশ্যই পালনীয়। এতে মাতা ও সন্তানের পার্থিব কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং পরকালে মাতার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান।

(খ) **জন্ম পরবর্তী অধিকার :**

মায়ের স্তনে সন্তানের অধিকার :

গাছের শাখা যেমন মূলের মুখাপেক্ষী, তেমনি শিশু জন্মের পর মায়ের উপর নির্ভরশীল। শিশুর জন্মের সাথে সাথে আল্লাহ্র রহমতে মাতৃস্তনে সৃষ্টি হয় শিশুর উপযোগী খাবার। সুতরাং পৃথিবীতে কোন মা যেন বিশেষ কারণ ছাড়া স্বীয় দুধপান থেকে সন্তানকে বঞ্চিত করে শিশুর অধিকার অস্বীকার না করেন। সন্তানকে দুধপান করানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَــنْ أَرَادَ أَنْ

৩. *আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/২০২৫, সনদ জাইয়িদ বা উত্তম।*

يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ. 'যে সকল জননী সন্তানদের পুরো সময় পর্যন্ত দুগ্ধ দান করতে ইচ্ছা রাখে, তারা নিজেদের শিশুদেরকে পুরো দু'বছর ধরে দুগ্ধ পান করাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*।

মায়ের বুকের দুধ শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানযুক্ত আল্লাহ প্রদত্ত এমন তৈরী খাবার, যা শিশু সহজেই হজম করতে পারে এবং তা শিশুর শরীরের বৃদ্ধি ঘটানোতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিশুর শরীরের খাদ্য চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে, মায়ের বুকের দুধে অনুরূপ পরিবর্তন প্রতিদিনই ঘটে থাকে। শিশুর দেহ যে পরিমাণ তাপমাত্রা হ'লে দুধ তার দেহে কাজে লাগতে পারে, সেরূপ তাপমাত্রা মায়ের বুকের দুধে বিদ্যমান থাকে। শিশুকে সুস্থ-সুন্দর করে গড়ে তুলতে হ'লে মায়ের বুকের দুধের বিকল্প নেই। মায়ের বুকের দুধে বেশ কিছু রোগ প্রতিরোধক উপাদান থাকে। যেমন- আই.জি.এ ল্যাকটোফেরিন এবং লাইসোজাইম। এছাড়াও মায়ের বুকের দুধে প্রচুর শ্বেত রক্তকণিকা থাকে যেগুলো আবার আই.জি.এ ল্যাকটোফেরিন, লাইসোজাইম, ইন্টারফেরন তৈরী করে। বাইফিজস ফ্যাকটর নামে আরও একটি পদার্থ মাতৃদুগ্ধে পাওয়া যায়। এগুলো সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করে। যার ফলে বাচ্চার দেহে ডায়রিয়া, কান পাকা রোগ, শ্বাসনালীর রোগ কম হয়। এছাড়া মাতৃদুগ্ধ পানে হৃৎপিণ্ডের রোগ, করোনারী, খাদ্যনালীর রোগ প্রভৃতি প্রতিরোধ করে। মায়ের দুধ পান শিশুর চেহারার লাবণ্য সৃষ্টি করে, বাকশক্তি ও সাধারণ বুদ্ধি বিকাশে সাহায্য করে।

বিশেষ কারণ ছাড়া কোন মা শিশুকে দুধ পান হ'তে বঞ্চিত করে যে ক্ষতি সাধন করে, তা অপূরণীয়। কারণ স্তন্যদান মায়ের মধ্যে সৃষ্টি করে শিশুর প্রতি এক বিশেষ স্নেহ প্রবণতা ও আবেগ-অনুভূতি। যে সকল মহিলা তাদের চাকচিক্য ও রূপ-লাবণ্য নষ্ট হবার ভয়ে শিশুকে বুকের দুধ পান করানো হ'তে বিরত থাকে, তাদের এ হীন মানসিকতা এখুনি পরিত্যাগ করা উচিত।

শিশুর স্বাস্থ্য, মন-মানসিকতা, চরিত্র ও রুচি গঠনে মায়ের দুধের ভূমিকা যথেষ্ট। বিশেষ কারণ বশতঃ কোন শিশুকে আপন মা ব্যতীত অন্য মহিলার দুধ পান করানোর প্রয়োজন হয়ে পড়লে, সেক্ষেত্রে দুশ্চরিত্রা ও অসুস্থ মহিলার দুধ পান করানো হ'তে বিরত রাখতে হবে।

স্নেহের পরশে প্রতিপালন :

সন্তান মায়ের হৃদয়ের দরদ ও পরম স্নেহ-যত্নের দাবীদার। মা কোন প্রকার ঘৃণা না করে আন্তরিক ভালবাসা দিয়ে সন্তানের পরিচর্যা করবে। আদর-স্নেহ হ'তে বঞ্চিত সন্তানদের স্বভাব-চরিত্রে বিরূপ পড়ে থাকে। স্নেহের পরশে প্রতিপালনকারী মা আল্লাহ্র অনুগ্রহের অংশীদারিণী হয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার হাসান বিন আলী (রাঃ)-কে স্বস্নেহে চুম্বন করেন। আকরা বিন হাবিস আত-তামিমী (রাঃ) এ দৃশ্য দেখে বললেন, إِنَّ لِىْ مِنَ الْوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِّنْهُمْ. 'আমার দশটি সন্তান আছে, আমি তাদের কাউকেই কোন দিন চুম্বন করিনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ 'যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না'।[৪]

অন্য আরেকটি হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَدِمَ نَاسٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوْا : أَتُقَبِّلُوْنَ صِبْيَاكُمْ؟ قَالُوْا : نَعَمْ، فَقَالُوْا لَكِنَّا وَاللهِ! مَانُقَبِّلُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْلِكُ أَنْ كَانَ اللهُ قَدْ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদল বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, তোমরা কি তোমাদের সন্তানদেরকে চুমু দাও? উপস্থিত সবাই বলল, হ্যাঁ। তখন তারা বলল, কিন্তু আল্লাহ্র কসম! আমরা তাদেরকে চুমু দেই না। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের অন্তর থেকে মায়া-মমতা তুলে নিলে আমি কী করতে পারি'।[৫]

সন্তান জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে মায়ের নিকট অধিক সময় থাকে। তাই মায়ের অপত্য স্নেহের পরশ না পেলে সে নিজেকে অসহায় মনে করবে। মনরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, এ অসহায়ত্বের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এমন রূপ ধারণ করবে যা সারা জীবন খেসারত দিয়েও পরিশোধ করা যাবে না।

পিতৃহারা সন্তানের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ :

সন্তানকে সমাজ ও সংসার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পিতা যেমনভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, অনুরূপভাবে মাকেও তাতে অংশগ্রহণ করতে হবে। আর পিতা মারা গেলে মা-ই এ মহান দায়িত্ব পালনে সব রকম সহযোগিতা প্রদানে ব্রতী হবেন। স্বামীর মৃত্যুর পর চেহারা-সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও অন্যের গৃহে না গিয়ে ইয়াতীম সন্তানদের প্রতিপালন ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পারেন এমন মহিলা সত্যিই নারী জাতির গৌরব। এ গৌরব অর্জনের জন্য তাকে প্রতিটি পদে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

প্রাথমিক জ্ঞান দান :

শিশু জন্ম হ'তে বিদ্যালয়ে গমনের পূর্ব পর্যন্ত মায়ের সান্নিধ্যে লালিত-পালিত হয়। আর মায়ের কোল থেকেই

৪. *তিরমিযী হা/১৯১১; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৯১, হাদীছ ছহীহ।*
৫. *ইবনু মাজাহ হা/৩৬৫, হাদীছ ছহীহ।*

www.at-tahreek.com

শিশুর শিক্ষা তথা জ্ঞান আহরণের যাত্রা শুরু হয়। শিশুর মন এ সময় অত্যন্ত কোমল থাকে, সে জন্য তখন তাকে যে শিক্ষা দেয়া হয়, তা সে সহজে গ্রহণ করে। এ শিক্ষা তার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হিসাবে কাজ করে। তাই শিশুর মুখে আধো আধো বুলি ফুটতে শুরু করলে মাকে কথা বলার সময় অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। সন্তানের সামনে কটু বা খারাপ বাক্য উচ্চারণ করা হ'তে সংযত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা প্রয়োজন। মায়ের মিষ্টিমিষ্টি কথা শিশুর অন্তরে প্রবলভাবে রেখাপাত করে। মা ইসলামের সুমহান শিক্ষার কথা সুমধুর ভাষায় শিশুর মাঝে ছড়িয়ে দিবেন। তাকে ইসলামের প্রাথমিক বিষয়সমূহ শিক্ষা দিবেন। অধিক ভোজনের অপকারিতা, জোরে চীৎকার করে কথা না বলা সম্পর্কে জ্ঞান দান করবেন। দুষ্টু প্রকৃতির ছেলে-মেয়েদের সাথে মিশতে, মিথ্যা ও অহেতুক কথা বলার মত অশালীন কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখবেন। নিজেদের কাজ যথাসম্ভব নিজ হাতে করার অভ্যাস গড়ে তুলতে শিক্ষা দিবেন। ভাল কাজ করলে ধন্যবাদ প্রদান এবং মন্দ কাজ করলে মৃদু শাসন করতে হবে।

শিশু একটি পুষ্পকলি। মা তার মধ্যে মানবীয় গুণাবলী, সুন্দর চরিত্রের রং, রূপ ও গন্ধ ভরে দিবেন। মায়ের অভিপ্রেত অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে শিশুর শিক্ষা হ'লে বৃহত্তর সমাজ ও জাতি নিঃসন্দেহে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে অভ্যস্ত করা :

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সৌন্দর্যের মূল ভিত্তি। কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত তার শরীরকে পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করার ব্যাপারে সচেষ্ট না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ইসলামের মানদণ্ডে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত এবং সর্বদিকে সম্মানিত ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত পানাহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের বেলায় সকল প্রকার ময়লা ও অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে থাকতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে না। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মা তার ছোট্টমণিকে শিশুকাল থেকে শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন। শরীরের রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার নিমিত্তে কাপড়-চোপড় পরিচ্ছন্ন, খাদ্যদ্রব্য পবিত্র রাখা এবং খাদ্যের পাত্র পরিষ্কার করা একান্ত দরকার। এ ব্যাপারে মা সন্তানকে অভ্যস্ত করে তুলবেন। কারণ পবিত্রতা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সহায়তা দান করে। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে, إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

যেমনিভাবে নিজের শরীর ও মনকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, তেমনিভাবে ঘর-দরজা, বাড়ীর চারপাশের পরিবেশ, রাস্তা-ঘাট, পরিষ্কার রাখতে হবে। একথা মা তার সন্তানকে শৈশব থেকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে এ ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলবেন। রাসূল (ছাঃ) এ সম্পর্কে বলেন, نَظِّفُوْا أَفْنِيَتَكُمْ 'তোমরা তোমাদের বাড়ির আঙ্গিনা ও সম্মুখ ভাগ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ'।[৬]

শৈশবে শিশুর মন অত্যন্ত পবিত্র এবং নরম থাকে। নরম মাটিকে কুমার যা ইচ্ছা তা করতে পারে। অনুরূপভাবে মা পবিত্র নরম হৃদয়ের শিশুটিকে পবিত্রতা তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যেরূপ প্রশিক্ষণ দান করবেন, সেভাবে জীবনের বাকী দিনগুলি সে অতিবাহিত করবে।

সৌজন্যবোধ শিক্ষা দান :

শিশু-সন্তান মাকে বেশী অনুসরণ করে। তাই মা শৈশবেই শিশুকে সৌজন্যবোধ শিক্ষা দিবে। যাতে করে শিশু প্রশংসনীয় কাজ ও সুন্দর চরিত্রে সজ্জিত হয়ে বড় হ'তে পারে। সন্তান যেহেতু বিশ্ব প্রকৃতির পবিত্র উপাদান এবং সমাজরূপী প্রাসাদের ইট সমতুল্য, সেহেতু সন্তানকে ভদ্রতা, বিনয়, সরলতা, সততা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি গুণাবলী শিক্ষা দানে মাতা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। একজন শিশু পরবর্তী জীবনে পৃথিবীর সকলের নিকট এক আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার জন্যই মায়ের নিকট হ'তে সে এই গুণাবলী অর্জনের অধিক হকদার।

উন্নত মন-মানসিকতা গঠন :

মানুষ আল্লাহ্র খলীফা। আল্লাহ্র হুকুম-আহকাম পালন করাই মানুষের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রতিটি মানুষের উপর একদিকে রয়েছে স্রষ্টার অধিকার, আর অপর দিকে রয়েছে অগণিত সৃষ্টির অধিকার। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির অধিকার সুন্দররূপে আদায়ের জন্য সন্তানের উন্নত মন-মানসিকতা গঠন করার ব্যাপারে মাকে সচেষ্ট হ'তে হবে। শিশুর মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি জাগ্রত করতে হবে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে আল্লাহ্র অধিকার পূর্ণরূপে আদায় করলে পরকালে চির সুখের স্থান জান্নাত পাওয়া যাবে। আর তা আদায় না করলে চরম শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। সৃষ্টির প্রতি অধিকার বলতে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন তথা বিশ্বের সকল সৃষ্টজীবের সাথে উত্তম আচরণ করলে ইহজীবনে শান্তি ও পরজীবনে পুরস্কার লাভে সক্ষম হবে, একথা তাদের মনের মধ্যে গ্রোথিত করে দিতে হবে। এছাড়াও অপসংস্কৃতির সয়লাব থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। তাদের মধ্যে বীরত্ব, দৃঢ়তা সৃষ্টি করা এবং ভীরুতা-কাপুরুষতা পরিহারের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। বৈধ সীমানার মধ্যে অবস্থান করে নিজের আত্মসম্মানবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দিতে হবে।

৬. *তিরমিযী হা/২৭৯৯; মিশকাত হা/৪৪৮৭, হাদীছ হাসান।*

অপরপক্ষে অন্যের সম্মান যেন বিনষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মোটকথা তাদেরকে পরিকল্পিত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে, যাতে করে তারা নিজেদেরকে বিশ্ববাসীর সামনে এক উত্তম উদাহরণ হিসাবে পেশ করতে সক্ষম হয়।

ব্যবহারিক শিক্ষা দান :

দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক কাজ রয়েছে, যা একজন মানুষ জীবনের ঊষালগ্ন হ'তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হ'লে বড় হয়ে তা পালনে ব্যর্থ হয়। নিজের ব্যবহৃত কাপড়-চোপড় গোছানো, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, অযূ-গোসল করে পাক-ছাফ হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সন্তানকে শিক্ষা দিতে হবে। বিশেষ করে মেয়ে সন্তানকে গৃহস্থালী কাজ-কর্মে অভ্যস্ত করে তোলা, রান্না-বান্না ও অন্যান্য কাজের শিক্ষা দিয়ে দক্ষ ও সুনিপুণ করে গড়ে তুলতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে তারা আদর্শ গৃহিনী হ'তে পারে। মানুষের চলার পথে ব্যবহারিক জীবনের কাজগুলি শিক্ষা দিয়ে সন্তানকে ভবিষ্যৎ জীবনের সোপান তৈরী করে দিতে মা একটি উত্তম প্রতিষ্ঠান। একথা স্মরণ রেখে প্রত্যেক মায়ের স্বীয় দায়িত্ব পালন করাই সন্তানের অধিকার।

তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া :

সন্তানের তত্ত্বাবধান করা একজন আদর্শ মায়ের বড় কর্তব্য। সন্তানকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৎ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই মাকে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে হয়। সন্তানকে উত্তমরূপে গড়ে তোলার ব্যাপারে মাকেই মমতাময়ীর ভূমিকা পালন করতে হবে। ইসলাম মাকে গৃহের দায়িত্বশীলরূপে স্থির করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান কর্তা। পুরুষ তার পরিবারের কর্তা আর নারী তার ঘরের কর্ত্রী'।[৭] হাদীছে এসেছে, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ. 'স্ত্রীরা নিজের স্বামীর ঘর ও তার সন্তানের রক্ষক, সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[৮]

সন্তানের প্রতিটি ক্ষেত্রে মা উত্তম পরিচালক হিসাবে পরিচয় দিতে না পারলে শিশুর উপরে উঠার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। চালক একটু অমনোযোগী হবার কারণে যেমনভাবে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে, তেমনভাবে মা তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে সামান্যতম বেখেয়াল হ'লে সন্তানের জীবনের সোনালী সূর্য অস্তমিত হয়ে কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। অতএব এ বিষয়ে আমাদের আরো সচেতন হ'তে হবে।

[চলবে]

৭. *সিলসিলা ছহীহা ৫/৬৯ পৃঃ, হা/২০৪১।*
৮. *বুখারী হা/৫২০০; মিশকাত হা/৩৬৮৫।*

শবেবরাত

আত-তাহরীক ডেস্ক

আরবী শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে 'শবেবরাত' বা 'লায়লাতুল বারাআত' (ليلة البراءة) বলা হয়। 'শবেবরাত' শব্দটি ফারসী। এর অর্থ হিস্সা বা নির্দেশ পাওয়ার রাত্রি। দ্বিতীয় শব্দটি আরবী। যার অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তির রাত্রি। এদেশে শবেবরাত 'সৌভাগ্য রজনী' হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করে যে, এ রাতে বান্দাহ্র গুনাহ মাফ হয়। আয়ু ও রূযী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের হায়াত-মউতের ও ভাগ্যের রেজিষ্ট্রার লিখিত হয়। এই রাতে রূহগুলো সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে মুলাক্বাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশেষ করে বিধবারা মনে করেন যে, তাদের স্বামীদের রূহ ঐ রাতে ঘরে ফেরে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে বিধবাগণ সারা রাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকেন। বাসগৃহ ধুপ-ধুনা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে আলোকিত করা হয়। অগণিত বাল্ব জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। এজন্য সরকারী পুরষ্কারও ঘোষণা করা হয়। আত্মীয়রা সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যায়। হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাজি করে হৈ-হুলোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। যারা কখনো ছালাতে অভ্যস্ত নয়, তারাও ঐ রাতে মসজিদে গিয়ে 'ছালাতে আল্ফিয়াহ' (الصلاة الألفية) বা ১০০ রাক'আত ছালাত আদায়ে রত হয়, যেখানে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরায়ে ইখলাছ পড়া হয়। সংক্ষেপে এই হ'ল এদেশে শবেবরাতের নামে প্রচলিত ইসলামী পর্বের বাস্তব চিত্র।

ধর্মীয় ভিত্তি :

মোটামুটি দু'টি ধর্মীয় আক্বীদাই এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। ১. ঐ রাতে বান্দাহ্র গুনাহ মাফ হয়। আগামী এক বছরের জন্য ভাল-মন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয় এবং এই রাতে কুরআন নাযিল হয়। ২. ঐ রাতে রূহগুলি ছাড়া পেয়ে মর্ত্যে নেমে আসে। হালুয়া-রুটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, ঐদিন আলাহ্র নবী (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবার সকাল বেলায়। আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দু'মাস পূর্বে শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রে...! এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির ধর্মীয় ভিত্তি কতটুকু তা খুঁজে দেখব। প্রথমটির সপক্ষে যে সব আয়াত ও হাদীছ পেশ করা হয়, তা

www.at-tahreek.com

নিম্নরূপ: ১. সূরায়ে দুখান-এর ৩ ও ৪ নং আয়াত-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ-

অর্থ: (৩) আমরা তো এটি অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে; আমরা তো সতর্ককারী (৪) এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়'। হাফেয ইবনে কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে মুবারক রজনী অর্থ লায়লাতুল ক্বদর'। যেমন সূরায়ে ক্বদর ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'নিশ্চয়ই আমরা ইহা নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে'। আর সেটি হ'ল রামাযান মাসে। যেমন সূরায়ে বাক্বারাহ্র ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ 'এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে'। এই রাতে এক শা'বান হ'তে আরেক শা'বান পর্যন্ত বান্দার রূযী, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীছ প্রচারিত আছে, তা 'মুরসাল' ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদর রজনীতেই লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ভাগ্যলিপি হ'তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা মৃত্যু, রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এরূপভাবেই বর্ণিত হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্হাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হ'তে।

অতঃপর 'তাক্বদীর' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হ'ল-

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ- وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ-

অর্থ: 'উহাদিগের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়, আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ..

'আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন' *(মুসলিম হা/৬৬৯০)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবে; এ বিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে' (পুনরায় তাক্বদীর লিখিত হবে না)। এক্ষণে শবেবরাতে প্রতিবছর ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। বরং 'লায়লাতুল বারাআত' বা ভাগ্যরজনী নামটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইসলামী শরী'আতে এই নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাকী রইল এই রাতে গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়। সেজন্য দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে ইবাদত করতে হয়। অন্ততঃ ১০০ শত রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়। প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা ও ১০ বার করে সূরায়ে 'ক্বুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ' পড়তে হয়। এই ছালাতটি গোসল করে আদায় করলে গোসলের প্রতি ফোঁটা পানিতে ৭০০ শত রাক'আত নফল ছালাতের ছওয়াব পাওয়া যায় ইত্যাদি।

এ সম্পর্কে প্রধান যে তিনটি দলীল পেশ করা হয়ে থাকে, তা নিম্নরূপ:

১. আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا الخ-

'মধ্য শা'বান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত কর ও দিনে ছিয়াম পালন কর। কেননা আল্লাহ পাক ঐদিন সূর্যাস্তের পরে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন ও বলেন, আছ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে ক্ষমা করে দেব; আছ কি কেউ রূযী প্রার্থী আমি তাকে রূযী দেব। আছ কি কোন রোগী আমি তাকে আরোগ্য দান করব'।

এই হাদীছটির সনদে 'ইবনু আবী সাব্রাহ' নামে একজন রাবী আছেন, যিনি হাদীছ জালকারী। সে কারণে হাদীছটি মুহাদ্দেছীনের নিকটে 'যঈফ'।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। কেননা একই মর্মে প্রসিদ্ধ 'হাদীছে নুযূল' ইবনু মাজাহ্র ৯৮ পৃষ্ঠায় মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে (হা/১৩৬৬) এবং বুখারী শরীফের (মীরাট ছাপা ১৩২৮ হিঃ) ১৫৩, ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় এবং 'কুতুবে সিত্তাহ' সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। সেখানে 'মধ্য শা'বান' না বলে 'প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ' বলা হয়েছে। অতএব ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহপাক প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করে বান্দাকে ফজরের সময় পর্যন্ত উপরোক্ত আহ্বান করে থাকেন; শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে মধ্য শা'বানের একটি রাত্রিতে নয়।

২. মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা রাত্রিতে একাকী মদীনার 'বাক্বী' গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, মধ্য শা'বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং 'কল্ব' গোত্রের ছাগল সমূহের লোম সংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন'। এই হাদীছটিতে 'হাজ্জাজ বিন আরত্বাত' নামক একজন রাবী আছেন, যার সনদ 'মুনক্বাত্বা' হওয়ার কারণে ইমাম বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে 'যঈফ' বলেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, 'নিছফে শা'বান'-এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ মরফূ হাদীছ নেই।

৩. ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন যে, তুমি কি 'সিরারে শা'বানের' ছিয়াম রেখেছ? লোকটি বললেন, 'না'। আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) তাকে রামাযানের পরে ছিয়াম দু'টির ক্বাযা আদায় করতে বললেন'।

জমহূর বিদ্বানগণের মতে 'সিরার' অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শা'বানের শেষাবধি নির্ধারিত ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা ঐটা তার মানতের ছিয়াম ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা লংঘনের ভয়ে তিনি শা'বানের শেষের ছিয়াম দু'টি বাদ দেন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ঐ ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বলেন। বুঝা গেল যে, এই হাদীছটির সঙ্গে প্রচলিত শবেবরাতের কোন সম্পর্ক নেই।

শবেবরাতের ছালাত :

এই রাত্রির ১০০ শত রাক'আত ছালাত সম্পর্কে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে তা 'মওযূ' বা জাল। এই ছালাত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে আবিষ্কৃত হয়। যেমন মিশকাতুল মাছাবীহ-এর খ্যাতনামা আরবী ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) 'আল-লাআলী' কেতাবের বরাতে বলেন, 'জুম'আ ও ঈদায়নের ছালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে 'ছালাতে আল্‌ফিয়াহ' নামে এই রাতে যে ছালাত আদায় করা হয় এবং এর সপক্ষে যেসব হাদীছ ও আছার বলা হয়, তার সবই বানোয়াট ও মওযূ অথবা যঈফ। এই বিদ'আত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের মূর্খ ইমামগণ অন্যান্য ছালাতের সঙ্গে যুক্ত করে এই ছালাত চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং মাতব্বরী করা ও পেট পুর্তি করার একটা ফন্দি এঁটেছিল মাত্র। এই বিদ'আতী ছালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেক্‌কার-পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্র গযবে যমীন ধসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন'।

এই রাতে মসজিদে গিয়ে একাকী বা জামা'আত বদ্ধভাবে ছালাত আদায় করা, যিকর-আযকারে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জানা যায় যে, শামের কিছু বিদ্বান এটা প্রথমে শুরু করেন। তারা এই রাতে সুন্দর পোষাক পরে, আতর-সুরমা লাগিয়ে মসজিদে গিয়ে রাত্রি জাগরণ করতে থাকেন। পরে বিষয়টি লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা-মদীনার আলেমগণ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু শামের বিদ্বানদের দেখাদেখি কিছু লোক এগুলো করতে শুরু করে। এইভাবে এটি জনসাধারণ্যে ব্যপ্তি লাভ করে।

রূহের আগমন :

এই রাত্রিতে 'বাক্বী'এ গারক্বাদ' নামক কবরস্থানে রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিঃসঙ্গ অবস্থায় যেয়ারত করতে যাওয়ার হাদীছটি *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯)* যে যঈফ ও মুনক্বাত্বা' তা আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি। এখন প্রশ্ন হ'লঃ এই রাতে সত্যি সত্যিই রূহগুলো ইল্লীন বা সিজ্জীন হ'তে সাময়িকভাবে ছাড়া পেয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে কি-না। যাদের মাগফেরাত কামনার জন্য আমরা দলে দলে কবরস্থানের দিকে ছুটে যাই। এমনকি মেয়েদের জন্য কবর যেয়ারত অসিদ্ধ হ'লেও তাদেরকেও এ রাতে কবরস্থানে দেখা যায়। এ সম্পর্কে সাধারণতঃ সূরায়ে ক্বদর-এর ৪ ও ৫নং আয়াত দু'টি পেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে বলা হয়েছে,

تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلاَمٌ، هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ-

'সে রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; ঊষার উদয়কাল পর্যন্ত'। এখানে 'সে রাত্রি' বলতে লায়লাতুল ক্বদর বা শবেক্বদরকে বুঝানো হয়েছে- যা এই সূরার ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে।

অত্র সূরায় 'রূহ' অবতীর্ণ হয় কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলি সব দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোন বিদ্বান করেননি। 'রূহ' শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে রূহ বলতে ফিরিশতাগণের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে।

শা'বান মাসের করণীয় :

রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েকটি দিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন'। যারা শা'বানের প্রথম থেকে নিয়মিত ছিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন করা উচিত নয়। অবশ্য যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন।

মোটকথা শা'বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য যারা 'আইয়ামে বীয'-এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই শা'বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেবরাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হ'লে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদ'আতী কোন আমল আল্লাহ পাক কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদ'আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

www.at-tahreek.com

শবেবরাত : কতিপয় ভ্রান্ত ধারণার জবাব

*হাফেয হাবীবুল্লাহ আল-কাসেম**

শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত 'শবেবরাত' বা 'লায়লাতুল বারাআত' বলে প্রচলিত আছে। শবেবরাত শব্দটি ফারসী। যার অর্থ হ'ল অংশ বা নির্দেশ পাওয়ার রাত্রি। শবেবরাতকে উপলক্ষ করে আমাদের সমাজে যা কিছু করা হয় তার প্রমাণ হিসাবে সূরা দুখানের ৩নং আয়াত পেশ করা হয়। এই আয়াত দ্বারা কতিপয় লোক মনে করেন যে, এই রজনীতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনের মত বরকতময় কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এই রজনীতে বান্দার গোনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়, আয়ু বৃদ্ধি করা হয়, রূযী বণ্টন করা হয়, হায়াত-মউতের রেজিষ্ট্রি করা হয়, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলো তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে এরাতে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পায়। তাই আত্মীয়-স্বজনরা এরাতে কবরস্থন যিয়ারত করতে যায়। ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, মসজিদগুলোকে আগরবাতি, মোমবাতি ও বিশেষ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। হালুয়া রুটি খাওয়ার হিড়িক পড়ে যায়।

মানুষ ভাল কাজের দিকে ধাবিত হোক এটা সকলেরই কামনা। কিন্তু সেই ভাল কাজটা যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ভাল কাজ হিসাবে প্রমাণিত না হয়, তাহ'লে উক্ত ভাল কাজকে ভাল বলা যায় না। কেননা তাঁর যুগে যে ইবাদতের উৎপত্তি হয়নি পরবর্তীতে তা চালু করার নামই হ'ল বিদ'আত। আর বিদ'আত হ'ল ভ্রষ্টতা। আসুন! শবেবরাতের প্রচলিত কর্মসূচীর সাথে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কর্মসূচীর কতটুকু মিল রয়েছে, তা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে যাচাই-বাছাই করে নিই।

শবেবরাত সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ও তার জবাব :

(১) কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِـي لَيْلَـةٍ مُّبَارَكَةٍ. 'আমরা তো কুরআন বরকতময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি' *(দুখান ৪৪/৩)*। আর সেই বরকতময় রজনী দ্বারা শবেবরাতই উদ্দেশ্য! বিধায় তা বিশেষভাবে পালনীয়।

জবাব : সূরা দুখানের উক্ত আয়াত দ্বারা শবেবরাতকে বুঝানো হয়নি; বরং রামাযানের ক্বদরের রাতকে বুঝানো হয়েছে। যেমন সূরা ক্বদরের প্রথম আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِـي لَيْلَـةِ الْقَـدْرِ 'অবশ্যই আমরা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি লাইলাতুল ক্বদরে' *(ক্বদর ৯৭/১)*। এ বিষয়ে মুফাসসিরগণের বক্তব্য হ'ল لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ দ্বারা শবেক্বদর বুঝানো হয়েছে। যা রামাযান মাসের শেষ দশকে হয়।[১]

(২) শবেবরাত ও শবেক্বদরের একই কাজ, উভয়টার মর্যাদা সমান।

জবাব : উক্ত ধারণা সঠিক নয়। শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রিকে 'শবেবরাত' বলা হচ্ছে। উক্ত রাত্রিতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে বলে কোন ছহীহ দলীল নেই। আর 'শবেক্বদর' হ'ল রামাযানের শেষ দশকে। যে রজনীতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ মর্মে কুরআনের আয়াত ও বহু ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْـزِلَ فِيْـهِ الْقُـرْآنُ 'রামাযান মাসই সে মাস যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। অন্যত্র বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَـدْرِ 'অবশ্যই আমরা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি লাইলাতুল ক্বদরে' *(ক্বদর ৯৭/১)*। এ ক্বদরের রাত্রির ফযীলত সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَـهْرٍ 'ক্বদরের রাত্রি হাযার মাসের চেয়েও বেশী উত্তম' *(ক্বদর ৯৭/৩)*।

শুধু কুরআনই নয়, বরং আল্লাহ যতগুলো আসমানী কিতাব বা ছহীফা অবতীর্ণ করেছেন তার সবগুলোই রামাযান মাসে অবতীর্ণ করেছেন। ওয়াছেলা ইবনুল আসক্বা' (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيْمَ فِىْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَـتِ التَّوْرَاةُ لِستٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَ الْاِنْجِيْـلُ لِـثَلاَثِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَ الْزَبُوْرُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِاَرْبَعٍ وَّعِشْـرِيْنَ خَلَـتْ مِـنْ رَمَضَانَ.

'ইবরাহীম (আঃ)-এর ছহীফা সমূহ রামাযানের ১ম তারিখে, তাওরাত রামাযানের ৬ তারিখে, ইঞ্জীল রামাযানের ১৩ তারিখে, যাবূর রামাযানের ১৮ তারিখে, কুরআন মাজীদ চব্বিশ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর পঁচিশের রাত্রিতে অবতীর্ণ করা হয়েছে'।[২]

* *মানামা, বাহরাইন।*

১. *তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, পৃঃ ১২৩৫।*
২. *বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/১৯১২১, মুসনাদে আহমাদ হা/১৭০২৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৭৫।*

www.at-tahreek.com

৩. ১৫ শা'বানের রাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করেন।

জবাব : উক্ত দাবী সঠিক নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِيْ الزُّبُرِ، وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ. 'তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়। আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ' *(ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে,

كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ.

'আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূকাতের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন'।[৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহহাক প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে, ক্বদর রজনীতেই লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ভাগ্যলিপি থেকে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী যেমন জন্ম, মৃত্যু, রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংগঠিত হবে সেগুলো লেখক ফেরেশতাগণের নিকট প্রদান করা হয়।[৪]

উল্লেখ্য, শবেবরাতে বান্দার রুযী, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীছ প্রচলিত আছে তার কোনটা মুরসাল, কোনটা যঈফ যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী।[৫]

(৪) ১৪ শা'বানের রাত্রে ইবাদত-বন্দেগী করতে হবে এবং দিনে ছিয়াম পালন করতে হবে। হাদীছে এসেছে, إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها 'মধ্য শা'বানের রাত্রিতে ইবাদত কর এবং দিনে ছিয়াম রাখ'।[৬]

জবাব : হাদীছটি জাল। এর সনদে ইবনু আবী সাবরাহ নামে একজন রাবী আছেন, মুহাদ্দিছগণের নিকট যিনি হাদীছ জালকারী হিসাবে পরিচিত।[৭] তাছাড়া এই হাদীছটি ছহীহ হাদীছ বিরোধী। কেননা একই মর্মে বর্ণিত অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীছগুলোতে ১৫ শা'বানের কথা উল্লেখিত হয়নি।

(৫) রজব মাস আগমন করার পর থেকেই একটি দো'আ বেশী বেশী করে পাঠ করতে হয়। রজব ও শা'বান মাস আসলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত দো'আ পাঠ করতেন। দো'আটি হ'ল- اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ 'হে আল্লাহ! রজব ও শা'বান মাসে আমাদের জন্য বরকত নাযিল করুন এবং রামাযান পর্যন্ত পৌঁছে দিন'।[৮]

জবাব : উক্ত বর্ণনার সনদে দুই জন মুনকার রাবী আছে। যেমন যায়েদ বিন আবির রুক্বাদ ও যিয়াদ আন-নুমারী। যায়েদ বিন আবির রুক্বাদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইবনু হাজার আসকালানী (রাঃ) বলেন, তিনি মুনকারুল হাদীছ। আর যিয়াদ আন-নুমারী সম্পর্কে ইবনে হিব্বান বলেন, তিনিও মুনকারুল হাদীছ।[৯]

মোটকথা হ'ল, শবেবরাতের ফযীলত সম্পর্কে আমাদের সমাজে যতগুলো হাদীছ প্রচলিত আছে সবই জাল ও যঈফ। আবু শামা বলেন, لَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيْثٌ يَصِحُّ. 'মধ্য শা'বানের ফযীলত সম্পর্কে একটি হাদীছও ছহীহ নেই'।[১০] আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেন, لَيْسَ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيْثٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ. 'মধ্য শা'বান সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য হাদীছ নেই।[১১] মূল কথা এই রাত সম্পর্কে যদি বিশেষ কিছু থাকত, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবাগণই তা পালন করতে আমাদের চেয়ে বেশী মনোযোগী হ'তেন। কিন্তু তাঁদের কেউ তো এই রাতে হালুয়া-রুটি বিতরণ, মসজিদে, দরগায়, কবরস্থানে আগরবাতী জ্বালাতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(৬) একদা ১৫ শা'বানের রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জান্নাতুল বাক্বী নামক কবরস্থানে একাকী যিয়ারত করেন। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমার পাশে না পেয়ে বাক্বীউল গারক্বাদ কবরস্থানে গিয়ে দেখি তিনি সেখানে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। এক পর্যায়ে আমাকে বললেন, হে আয়েশা!

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ

মধ্য শা'বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং কলব গোত্রের ছাগল সমূহের পশম সংখ্যার চাইতেও বেশী সংখ্যক লোককে তিনি ক্ষমা

৩. *মুসলিম হা/৬৬৯০; মিশকাত হা/৮৯।*
৪. *তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, পৃঃ ১৪৬৮।*
৫. *মাসিক আত-তাহরীক, ১৩/৮০৮।*
৬. *ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৮; শু'আবুল ঈমান হা/৩৮২২।*
৭. *সিলসিলা যঈফাহ হা/২১৩২; মিশকাত হা/১৩০৮; ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৮।*
৮. *আহমাদ হা/২৩৪২; শু'আবুল ঈমান হা/৩৮১৫।*
৯. *মিশকাত হা/১৩৬৯।*
১০. *শায়খ বিন বায, আত-তাহযীর মিনাল বিদা', পৃঃ ১১; ড. সুলায়মান বিন সালিম আস-সুহায়মী, আল-আইয়াদ, পৃঃ ৩৭৩।*
১১. *ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন ৪/১৬৯০।*

করে থাকেন'।[১২] উলেখ্য, জান্নাতুল বাকী নামটি সঠিক নয়। সঠিক নাম বাক্বীউল গারক্বাদ।

জবাব : প্রচলিত হাদীছটি যঈফ। এই হাদীছের বর্ণনাকারীদের মাঝে একজন এমন ব্যক্তি আছে যার নাম হাজ্জাজ। তার সনদ মুহাদ্দিছগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী ও তিরমিযী এই হাদীছকে যঈফ বলেছেন।[১৩]

ছহীহ হাদীছ হ'ল প্রতি রাতেই আলাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

يَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ، حِيْنَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَيَقُوْلُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ! مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ! مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَلَهُ! فَلاَيَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيْءَ الْفَجْرُ.

'আলাহ তা'আলা প্রতি রাতেই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। আর বলতে থাকেন, আমি বাদশাহ! কে আমার কাছে দো'আ করবে, আমি তার দো'আ কবুল করব। কে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে দিব। কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করব। এইভাবে ফজর পর্যন্ত চলতে থাকে'।[১৪]

উক্ত হাদীছটি যে শুধু একজন ছাহাবী থেকেই বর্ণিত হয়েছে তা নয়; বরং ২৩ জন ছাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাফেয আবুল কাসেম ইসপাহানী (রহঃ) বলেন, رَوَاهُ ثَلاَثَةٌ وَّعِشْرُوْنَ مِنَ الصَّحَابَةِ سَبْعَةُ عَشَرَ رَجُلاً وَسِتُّ امْرَأَةٍ 'আলাহ তা'আলা প্রতি রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে এইভাবে আহ্বান করার ব্যাপারে ২৩ জন ছাহাবী থেকে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তার মাঝে ১৭ জন পুরুষ ও ৬ জন মহিলা আছেন'।[১৫]

১২. *মুসনাদে আহমাদ হা/২৫৪৮৭; শু'আবুল ঈমান হা/৩৮২১; তিরমিযী হা/৭৩৯।*
১৩. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৪৪; ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯; মিশকাত হা/১২৯৯; ইবনে তায়মিয়াহ, তাহযীব ইক্বতিযাউছ ছিরাতিল মুস্ত াক্বীম ১/১০১ পৃঃ।*
১৪. *বুখারী হা/১০৯৪; মুসলিম হা/১৭৭০; তিরমিযী হা/৪৪৬; দারেমী হা/১৪৫০; মুসনাদে আহমাদ হা/৭৫৬৭।*
১৫. *সিলসিলা যঈফা হা/১৯৬২।*

(৭) শবেবরাতে মৃত ব্যক্তিদের রূহ দুনিয়াতে নেমে আসে। এর দলীল হ'ল, تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. 'সে রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতি ক্রমে' *(ক্বদর ৯৭/৪)*।

জবাব : আয়াতে রূহ দ্বারা মৃত ব্যক্তিদের বুঝানো হয়নি। যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া হয় তথাপিও সেটা শবেবরাতে নয়, তা হবে রামাযান মাসে শবেক্বদরে। কেননা এই সূরা অবতীর্ণ করা হয়েছে 'লায়লাতুল ক্বদর' সম্পর্কে। দ্বিতীয় কারণ হ'ল রূহ শব্দটি একবচন, তার বহুবচন হ'ল আরওয়াহ। যদি মৃত ব্যক্তিদের রূহ সমূহ সে রাতে দুনিয়ায় অবতরণ করত তাহ'লে বলা হ'ত আরওয়াহ। কিন্তু এখানে তা বলা হয়নি, বরং রূহ বলা হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এই রূহ দ্বারা কোন মানুষের রূহকে বুঝানো হয়নি। বরং জিবরীল (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে।[১৬] কারণ ক্বদরের রাত্রি সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই রাত্রিতে ফেরেশতাদের এক বিশাল বাহিনী দুনিয়ার বুকে অবতরণ করেন। তাই তাদের সাথে তাদের সর্দার জিবরীল (আঃ)ও আগমন করেন। তাই তাকে রূহ বলা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, রাসূলুলাহ (ছাঃ) বা ছাহাবাদের থেকে যে আমল ছহীহভাবে প্রমাণিত আছে তা ছোট হ'লেও তা পালন করার মাঝেই রয়েছে রাসূলুলাহ (ছাঃ)-এর সত্যিকারের আনুগত্য। এর বাইরে যে কোন আমলই হোক না তাতে নেই কোন সফলতা, আছে শুধু ভ্রষ্টতা। তাই আসুন, আমরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ জেনে শুনে সঠিক আমলগুলোই করি এবং যাবতীয় বিদ'আতী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকি। আলাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন- আমীন!

সুন্নাতের রাস্তা ধরে নির্ভয়ে চল
হে পথিক! জান্নাতুল ফেরদৌসে
সিধা চলে গেছে এ সড়ক।

১৬. *তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, পৃঃ ১৪৬৮।*

মনীষী চরিত

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)

নূরুল ইসলাম

(২য় কিস্তি)

শিক্ষকতা :

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) মাত্র ১৮ বছর বয়সে ১৩৪৫ হিঃ/১৯২৭ খৃষ্টাব্দে দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লী ফারেগ হয়ে সে বছরই সেখানে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন।[১] এত অল্প বয়সে তদানীন্তন ভারতবর্ষে ইলমে দ্বীন চর্চার নাভিমূলে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হওয়া সত্যিই বিস্ময়কর। কারণ রহমানিয়া মাদরাসা তখন ভারতবর্ষে আহলেহাদীছদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রতিষ্ঠাতাদের ঐকান্তিকতা, শিক্ষকদের যোগ্যতা, শিক্ষার মান, যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম, নিয়ম-কানূন প্রভৃতি কারণে অল্প সময়ের ব্যবধানেই ভারতবর্ষ ও বহির্বিশ্বে এ মাদরাসার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে আধুনিক সঊদী আরবের হিজায ও নাজদ সহ অন্যান্য দেশ থেকেও ছাত্ররা এখানে পড়তে আসত।[২]

রহমানিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নের সময় মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আতাউর রহমান ও অন্যান্য খ্যাতিমান শিক্ষকগণ তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, ফলাফল ও পাণ্ডিত্যে বিমুগ্ধ-বিমোহিত হয়েই তাঁকে শিক্ষক হিসাবে সাদরে বরণ করে নেন। মুবারকপুরীর ছাত্র জীবনের সোনালী দিনগুলো যেখানে কেটেছে, সেখানে শিক্ষকতা করার চেয়ে পরম আনন্দের আর কী হ'তে পারে!

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় দিল্লী ও অন্যান্য শহরে সৃষ্ট দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে রহমানিয়া মাদরাসার তত্ত্বাবধায়ক আব্দুল ওয়াহ্হাব (প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আতাউর রহমানের ছেলে) পাকিস্তানের করাচীতে হিজরত করার কারণে মাদরাসাটি বন্ধ হয়ে যাওয়া[৩] পর্যন্ত সুদীর্ঘ বিশ বছর মুবারকপুরী সেখানে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। মাঝখানে দু'বছর আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ)-কে তিরমিযীর ভাষ্য 'তুহফাতুল আহওয়াযী' প্রণয়নে সহযোগিতার জন্য তিনি মুবারকপুরে অবস্থান করেন। এরপর পুনরায় স্বীয় কর্মস্থলে ফিরে পূর্বের ন্যায় পাঠ দানে মনোনিবেশ করেন।

দীর্ঘ ২০ বছরের শিক্ষকতা জীবনে তিনি ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, তিরমিযী, আবূদাঊদ, মুওয়াত্তা মালেক ও বুলূগুল মারাম ছাড়াও শরহে বেকায়া, শরহে মুল্লা জামী প্রভৃতি গ্রন্থ পড়ান। সাথে সাথে ফৎওয়া প্রদানও অব্যাহত থাকে।[৪]

মুবারকপুরী অত্যন্ত পরিশ্রমী শিক্ষক ছিলেন। পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে তবেই ক্লাসে যেতেন। ক্লাসের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য রাত্রে তিনি গভীর অধ্যয়নের সাগরে ডুবে যেতেন নিবিষ্টচিত্তে। কখনো কখনো অধ্যয়নরত অবস্থায় ফজরের আযান হয়ে যেত। ফজরের ছালাতের পরপরই তিনি ছহীহ বুখারীর দরস দিতেন। তদীয় ছাত্র, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান রহমানী (১৯১৩-২০০৭) বলেন, 'শায়খ ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুওয়াত্তা মালেক-এর দরস দেয়ার জন্য যুরকানী কৃত মুওয়াত্তার শরাহ, শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬২) লিখিত মুওয়াত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুসাউওয়া ও মুছাফফা ও অন্যান্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন এবং তাঁর সূক্ষ্ম হস্তলিপি দ্বারা টীকা-টিপ্পনী ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুওয়াত্তার হাশিয়ায় লিপিবদ্ধ করতেন'।[৫]

তাঁর অন্য আরেকজন ছাত্র মুহাম্মাদ মুরতাযা বলেন, 'দরস দেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করার সময় তিনি যে বিষয়ে দরস দিবেন সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য নাহু, ছরফ, ইলমুল মা'আনী, বায়ান, তাফসীর ও অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন'।[৬]

উল্লেখ্য, মুবারকপুরী দারুল হাদীছ রহমানিয়ায় শিক্ষকতাকালে তাঁর পরিবার-পরিজনকে দিল্লীতে নিয়ে যাননি। আব্দুস সালাম রহমানীকে লেখা একটি পত্রে এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বাইরে কর্মজীবন অতিবাহিত করার সময় পরিবার-পরিজনকে সাথে নিয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে প্রশান্তির কারণ। কিন্তু একই সাথে তা ব্যস্ততাও বাড়িয়ে দেয়। এতে ইলমী কর্মকাণ্ড বিশেষতঃ অধ্যয়ন ও পাঠদানে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এজন্য আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দিল্লীতে অবস্থানের সময় পরিবার-পরিজনকে সাথে নিয়ে যাইনি'।[৭]

এভাবে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে গিয়ে তিনি তাঁর জ্ঞান সাগরের মূল্যবান মণি-মুক্তা-পান্না ছাত্রদের মাঝে ঢেলে দিতেন এবং বইয়ের পাঠাংশের বিশদ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে তার দুর্বোধ্যতা ও জটিলতার বদ্ধ দুয়ার উন্মোচন করতেন। ছাত্ররা পাঠদানকৃত বিষয়টি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছে- এ ধারণা বদ্ধমূল হবার পরই কেবল তিনি অন্য বিষয়ে পাঠদানে উদ্যত হ'তেন। তাঁর হাদীছ পড়ানোর নিয়ম এরূপ ছিল- প্রথমতঃ কোন একজন ছাত্র তিনটি হাদীছ পড়ত। অতঃপর তিনি হাদীছের

---

১. *মির'আতুল মাফাতীহ ১/৯; তারাজিম, পৃঃ ৩২৯; আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৪০; ছাওতুল উম্মাহ, ডিসেম্বর '০৮, পৃঃ ১৮, জানুয়ারী '০৯, পৃঃ ১৩।*
২. *জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত, পৃঃ ২৬; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৫৪।*
৩. *জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত, পৃঃ ২৭; মির'আতুল মাফাতীহ ১/১০; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৫৫।*
৪. *মির'আতুল মাফাতীহ ১/১০; ছাওতুল উম্মাহ, খণ্ড ৪১, সংখ্যা ৫, মে ২০০৯, পৃঃ ২৩-২৪; আল-বালাগ, মার্চ '৯৪, পৃঃ ৪০।*
৫. *সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' (উর্দূ), লাহোর, পাকিস্তান, নভেম্বর '৯৪, পৃঃ ২০-২১।*
৬. *মুহাদ্দিছ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।*
৭. *মাকাতীবে রহমানী, পৃঃ ৩০।*

www.at-tahreek.com

তাখরীজ ও সনদ বর্ণনা করার পর মতন (Text) ব্যাখ্যা করতেন। হাদীছ ব্যাখ্যা করার সময় ফকীহদের মতামত ও দলীল বর্ণনা করে সঠিক মতটি উপস্থাপন করতেন। সাথে সাথে পঠিত হাদীছগুলো পরস্পর বিরোধী হ'লে তাদের মাঝে সুন্দরভাবে সমন্বয় সাধন করতেন। অবশ্য কখনো কখনো পঠিতব্য বইয়ের পাদটীকায় লিখিত নিজস্ব টীকা-টিপ্পনীর সহযোগিতা নিতেন।[৮]

শরহে বেকায়াহ পড়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর জনৈক ছাত্র বলেন, 'শায়খ মুবারকপুরী আমাদেরকে শরহে বেকায়াহ-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পড়াতেন। তিনি পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করতেন। প্রত্যেক বিষয়ে তিনি গভীর মনীষার অধিকারী ছিলেন বিধায় পূর্ণ যোগ্যতার সাথেই পাঠদান করতেন। তিনি বইয়ের হাশিয়ায় টীকা-টিপ্পনী ও অধ্যয়নের সারাংশ লিখতেন। পড়ানোর সময় মুচকি হাসতেন এবং ক্লাসের সকল ছাত্রের দিকে দৃষ্টি দিতেন। ছাত্ররা কতটুকু পড়া বুঝেছে তা পরখ করতেন। তিনি ফিকহের ক্লাসে হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের মানহাজ (পদ্ধতি) এবং হাদীছের ক্লাসে মুহাদ্দিছগণের মতামত বিশেষ করে হাফেয ইবনু হাজার আসকালানীর (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) মতামত ও দলীলাদি উল্লেখ করতেন'।[৯]

মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান রহমানী বলেন, 'শায়খ মুবারকপুরী ইলমে হাদীছে পূর্ণ দক্ষতা রাখতেন। ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে গুরুত্বের সাথে দরস দিতেন। তিনি ছাত্রদের নিকট শারঈ ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল উপস্থাপন করে তাদের তথ্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতেন ও জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করতেন। তিনি উপকারী তথ্যাবলী একত্রিত করে ক্লাসে উপস্থাপন করতেন।[১০]

তাঁর হাদীছের দরসের দারুণ খ্যাতি ছিল। ফলে তাঁর কাছ থেকে এ বিষয়ে বিশেষ করে ছহীহ বুখারী, আবূদাঊদ ও তিরমিযীর দরস গ্রহণ করার জন্য দারুল হাদীছের ছাত্ররা ছাড়াও অন্যান্য মাদরাসার শিক্ষক ও শায়খুল হাদীছরাও উপস্থিত হতেন।[১১] তাঁর দরসে যে সকল প্রথিতযশা আলেম উপস্থিত হ'তেন তাঁদের মধ্যে 'তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ' গ্রন্থের লেখক ইমাম খান নওশাহরাবী[১২] ও মাওলানা আব্দুল হাসান নাদভী (হানাফী) অন্যতম। ইমাম খান নওশাহরাবী মাঝে-মধ্যে দারুল হাদীছ পরিদর্শন করতেন এবং মুবারকপুরীর দরসে বসতেন।[১৩]

'সীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ' গ্রন্থের লেখক আব্দুল হাসান নাদভী (১৯১৪-২০০০) বলেন, 'যখন শায়খ মুবারকপুরী দিল্লীতে হাদীছ পাঠদানের বরকতমণ্ডিত কাজে মশগুল ছিলেন, তখন আমি তাঁর দরসে উপস্থিত হয়ে খুবই সৌভাগ্যবান ও আনন্দিত হয়েছি এবং তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি ও ইলমে হাদীছে অপরিসীম যোগ্যতা অনুধাবন করেছি'।[১৪]

ছাত্রমণ্ডলী :

সুদীর্ঘ ২০ বছরের শিক্ষকতা জীবনে ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর কাছে অসংখ্য ছাত্র দরস গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কতিপয় ছাত্র হচ্ছেন-

১. মাওলানা আব্দুর রঊফ ঝাণ্ডানগরী : মাওলানা আব্দুর রঊফ বিন নে'মাতুল্লাহ বিন মোতী খান বিন বখতিয়ার খান নেপালের কপিলবস্তু যেলার ঝাণ্ডানগর হ'তে ২০ কিলোমিটার উত্তরে কাদারবাটুয়া গ্রামের এক হানাফী আলেম পরিবারে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহশিক্ষক মিয়াঁ মালেক আলীর কাছে পাঠ গ্রহণ শেষে তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত ঝাণ্ডানগর মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে মাওলানা খলীল আহমাদ বিসকুহারীর নিকটে মীযান, মুনশা'আব পড়েন। অতঃপর বেনারসের মদনপুরা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে মাওলানা মুনীর আহমাদের ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। এখানে অধ্যয়নরত অবস্থায় মায়ের অসুখের খবর পেয়ে নেপালে ফিরে আসেন এবং ঝাণ্ডানগরে বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক মাওলানা আব্দুল গফূর ও অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট পড়তে থাকেন। এখানে ৬ষ্ঠ

---

৮. মাসিক 'ছিরাতে মুস্তাকীম' (উর্দূ), বার্মিংহাম, লন্ডন, নভেম্বর-ডিসেম্বর '৯৮, পৃঃ ১৫।

৯. মুহাদ্দিছ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৬।

১০. ছিরাতে মুস্তাকীম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫।

১১. মুহাদ্দিছ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।

১২. মাওলানা আব্দুল গনী ওরফে আবূ ইয়াহ্ইয়া ইমাম খান নওশাহরাবী আলেম, ঐতিহাসিক, গ্রন্থকার, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি ১৮৯০ সালে নওশাহরাহ (পাকিস্তান) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নওশাহরাবীর দাদা নওশাহরাহ থেকে হিজরত থেকে গুজরানওয়ালা যেলার সোহদারাহতে থিতু হন। এখানেই তাঁর শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। পণ্ডিত দিনানাথের কাছে ফার্সী পড়ার পর তিনি ইলমে দ্বীন হাছিলের জন্য সোহদারাহ-এর 'মাদরাসা হামীদিয়াহ'তে ভর্তি হন। এরপর তিন ওয়াযীরাবাদে গিয়ে হাফেয আব্দুল মান্নান ওয়াযীরাবাদী (১২৬৭-১৩৩৪ হিঃ) ও মাওলানা ওমরুদ্দীনের কাছে কিছু কিতাব পড়েন। তারপর অমৃতসর গিয়ে 'মাদরাসা গযনবিয়াহ'তে ভর্তি হন। এখানে তিনি মাওলানা নেক মুহাম্মাদ, মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন হাযারাবী এবং মাওলানা আব্দুল্লাহ ভূজিয়ানীর কাছে পাঠ গ্রহণ করেন। শিক্ষা গ্রহণ শেষে তিনি ১৯১৯ সালে সোহদারাহতে ফিরে আসেন। ১৯২১ সালে গুজরানওয়ালায় গিয়ে তিনি একটি পত্রিকায় চাকুরী নেন। এরপর জীবিকার তাগিদে ভারতে পাড়ি জমান। দেশ বিভাগের পর তিনি লাহোরে বসবাস শুরু করেন। কর্মজীবনে ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ (অমৃতসর), আখবারে মুহাম্মাদী (দিল্লী), আহলেহাদীছ গেজেট (দিল্লী), মাসিক যামানা (লক্ষ্ণৌ), মাসিক মা'আরিফ (আযমগড়) সাপ্তাহিক আল-ই'তিছাম (লাহোর, পাকিস্তান), সাপ্তাহিক চাটান (ঐ) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮), মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (১৮৯০-১৯৪১), মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ দাঊদ গযনবী (মৃঃ ১৯৬৩ খৃঃ), মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী, মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদভী, মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী (১৯০৯/১০-১৯৮৭) প্রমুখ আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। নওশাহরাবীর গ্রন্থের সংখ্যা ২৬টি। তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, হিন্দুস্তান মেঁ আহলেহাদীছ কী ইলমী খিদমাত, হিন্দুস্তান মেঁ ইলমে হাদীছ, মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর জীবনী 'নুকূশে আবুল ওয়াফা' (২ খণ্ড) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম। আহলেহাদীছদের পরম হিতাকাঙ্খী এই আলেমে দ্বীন ১৬ জানুয়ারী ১৯৬৬ মোতাবেক ২৪ রামাযান ১৩৮৫ হিজরীতে সোহদারাহতে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। দ্র. মাসিক শাহাদত (উর্দূ), ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, খণ্ড ১৪, সংখ্যা ৫, মে ২০০৭, পৃঃ ৩০-৩১।

১৩. ছাওতুল উম্মাহ, মে '০৯, পৃঃ ২৭।

১৪. মুহাদ্দিছ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১।

জামা'আত শেষ করার পর তিনি 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া' দিল্লী গমন করেন। এ প্রতিষ্ঠানে তিনি শায়খুল হাদীছ আহমাদুল্লাহ প্রতাপগড়ী, নাযীর আহমাদ আমলুবী (মৃঃ ১৯৬৮ খৃঃ), ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী প্রমুখের ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। ফারেগ হওয়ার পর তিনি রহমানিয়া মাদরাসাতেই শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। সেখানে বছরখানেক শিক্ষকতা করার পর ঝাণ্ডানগরের 'সিরাজুল উলূম' মাদরাসায় যোগ দেন। সেখানে দু'বছর শিক্ষকতা করার পর জামে'আ রহমানিয়া মদনপুরা, বেনারসে নিয়োগ পেয়ে তিন বছর শিক্ষকতা করার পর পুনরায় ঝাণ্ডানগরে ফিরে আসেন। পিতার মৃত্যুর পর তার সুদক্ষ পরিচালনায় সিরাজুল উলূম মাদরাসাটি একটি খ্যাতনামা দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

মাওলানা ঝাণ্ডানগরী খ্যাতিমান বাগ্মী ছিলেন। তাঁর বাগ্মিতা মন্ত্রমুগ্ধ করত শ্রোতামণ্ডলীকে। নেপালে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান অবিসংবাদিত। ১৯৯১ সালের ৫ নভেম্বরে 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ নেপাল' গঠিত হ'লে তিনি আমীর নিযুক্ত হন। ছিয়ানাতুল হাদীছ (দুই খণ্ড, মোট পৃষ্ঠা ৪০০), নুছরাতুল বারী ফী তায়ীদে ছহীহিল বুখারী প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৪টি।[১৫]

২. মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান রহমানী ওমরপুরী : মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান রহমানী ওমরপুরী ভারতের মুযাফফরনগর যেলার ওমরপুরের ওমরী খান্দানের কৃতীসন্তান। তিনি ১৯১৩ সালের ২০ জুলাই দিল্লীর নিকটবর্তী 'রোহতাক' নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা আব্দুল জব্বার ওমরপুরী (১২৭৭-১৩৩৪ হিঃ/১৯১৬ খৃঃ) ও বাবা আব্দুস সাত্তার ওমরপুরী (১৩০৮ হিঃ-৬ মার্চ ১৯১৬) দু'জনই খ্যাতিমান আলেম, শিক্ষক ও গ্রন্থ রচয়িতা ছিলেন। জন্মের তিন বছর পর (১৯১৬ সালে) দাদা, বাবা মা ও ছোট ভাই আব্দুল কাহ্হারকে হারিয়ে তিনি দাদির তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। মাওলানা আব্দুল গাফফার দ্বীনী ইলম অর্জনের জন্য দিল্লীর কিশানগঞ্জে অবস্থিত আল-হুদা মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে প্রাথমিক বইপত্র অধ্যয়নের পর তিনি কলকাতার দারুল হাদীছ মাদরাসায় ভর্তি হন। এরপর দিল্লীর রহমানিয়া মাদরাসায় গিয়ে প্রখ্যাত শিক্ষকদের কাছে জ্ঞানার্জন করে ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে ফারেগ হন। এখানে তিনি ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীর ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। রহমানিয়া মাদরাসা থেকে ফারেগ হওয়ার পর কিছুদিন সেখানেই শিক্ষকতা করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটি থেকে 'ফাযেলে আদব' (আরবী) এবং ১৯৪০ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে 'মৌলবী ফাযেল' (আরবী) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৬-৪২ পর্যন্ত বেনারসের মাদরাসা রহমানিয়াতে তাফসীর, হাদীছ, আরবী সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে পাঠদান করেন। ১৯৪২-১৯৪৮ পর্যন্ত পূর্ব পাঞ্জাবের মালিরকোটলা কাওছারুল উলূম মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানে চলে যান। ১৯৪৮-৬৪ সাল পর্যন্ত লাহোর, সিয়ালকোট, রাওয়ালপিণ্ডি, ফয়ছালাবাদ, সাহীওয়াল ও করাচীতে পাঠদান করেন।

১৯৬৪-১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৮১-৮৫ সাল পর্যন্ত জামে'আ তা'লীমাতে ইসলামিয়া ফয়ছালাবাদে বুখারীর দরস দেন। অনলবর্ষী আহলেহাদীছ বাগ্মী আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (১৯৪০-২৩ মার্চ ১৯৮৭) তাঁর খ্যাতিমান ছাত্র ছিলেন। আযমাতে হাদীছ, ইন্তেখাবে হাদীছ, মি'য়ারী খাতূন, দ্বীন মেঁ গুলু, হাকীকাতে দো'আ, হাকীকাতে রামাযান প্রভৃতি তার উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯৮৯ সালের দিকে তিনি আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে গবেষণা পরিষদ গঠন করেন। জেনারেল যিয়াউল হকের সময় তিনি 'ইসলামী নাযরিয়াতী কাউন্সিল'-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ২২ মার্চ ২০০৭-এ দুপুর ১১-টায় ৯৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। পরের দিন ইসলামাবাদে তাকে দাফন করা হয়।[১৬]

৩. ড. আফতাব আহমাদ রহমানী : ড. আফতাব আহমাদ রহমানী ১৯৩৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশের দিনাজপুর যেলার বিরল থানার অন্তর্গত মুরাদপুর (সাত ভাইয়া পাড়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মুহাম্মাদ ওমর মোল্লা। দেশে দরসে নিযামীর পাঠ গ্রহণ করে তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে ১৯৩৯ সালের শেষের দিকে 'জামে'আ নাযীর হুসাইন' (ফাটক হাবাশ খাঁ, দিল্লী) মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে এক বছর তিনি মিশকাতুল মাছাবীহ, শরহে জামী, সাব'আ মু'আল্লাকা প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৯৪৪ সালে দারুল হাদীছ রহমানিয়া, দিল্লী থেকে ফারেগ হন। এখানে ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী সহ অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করেন। রহমানিয়া থেকে ফারেগ হওয়ার পর তিনি দিল্লী জামে মসজিদের পূর্ব-দক্ষিণে 'মছলিওয়ালান' রোডে অবস্থিত জামে আ'যম (বর্তমান নাম রিয়াযুল উলূম, প্রতিষ্ঠা : ১৩০২ হিঃ) মাদরাসায় এক বছর শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৬ সালে রহমানিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার নিয়োগপত্র পান। কিন্তু তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে দিল্লীতে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত থাকেন। ১৯৪৬ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৌলভী পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৯ সালে দিনাজপুর হাই মাদরাসা থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান, ১৯৫১ সালে সিরাজগঞ্জ ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান, ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

১৫. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৬১-৬২; আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৪৯০-৯৩, ৪৯৫।*

১৬. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৫৯-৬০; তারাজিম, পৃঃ ১৬০-৬১; পাক্ষিক 'তারজুমান', দিল্লী, খণ্ড ২৭, সংখ্যা ১১, ১-১৫ জুন ২০০৭, পৃঃ ২৬-২৮।*

বি.এ সম্মান (আরবী) পরীক্ষায় এবং ১৯৫৬ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এম.এ-র রেজাল্ট হওয়ার আগেই ১৯৫৬ সালে তিনি দিনাজপুর যেলার পার্বতীপুর থানার নূরুল হুদা হাই মাদরাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর দায়িত্ব পান।

১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগে আরবীর সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। তিনি "Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani and His Contribution to Hadith Literature" বিষয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৮ সালে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি লন্ডনের ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "The life and Works of Ibn Hajar Al-Asqalani (Accompanied by a critical edition of certain sections of Al-Sakhawi's Al-Jawahir wa Al-Durar)" শিরোনামে গবেষণা করে দ্বিতীয় বার পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। এ থিসিসটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ২০০০ সালের জুলাইয়ে প্রকাশিত হয়েছে (মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৯৩)। তাঁর পিএইচ.ডির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ প্রফেসর এ.জে আরবেরী (The Seven Odes গ্রন্থের লেখক)। তাঁর মৃত্যুর পর প্রফেসর আর.বি সার্জেন্ট ও প্রফেসর ড. আব্দুল মুঈদ খান তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেন। ক্যাম্ব্রিজে অধ্যয়নকালে তিনি প্রিয় শিক্ষক ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীকে একটি চিঠি লিখেন, যেটি 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর মুখপত্র পাক্ষিক 'তারজুমান'-এ (দিল্লী) হুবহু প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সালে তিনি দেশে ফিরে পুনরায় ভাষা বিভাগে যোগদান করেন এবং এ সালেই সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৯৮১ সালের ২২ জুন প্রফেসর পদে উন্নীত হন। তিনি ১৯৭৩-৭৬ পর্যন্ত ভাষা বিভাগের সভাপতি এবং ২৫.০৮.১৯৭৮ থেকে ২৪.০৮.১৯৮১ সাল পর্যন্ত আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আরবী বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যাকাত বোর্ডের সদস্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সদস্য, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস-এর সম্পাদক এবং 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি ছিলেন। Islamic Literature (লাহোর, পাকিস্তান), তর্জুমানুল হাদীস (ঢাকা), দৈনিক আজাদ (ঢাকা), مجلة المؤسسة الإسلامية (ইফাবা. ঢাকা), প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর ৩৩টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৮৪ সালের ২১ এপ্রিল শনিবার ভোর ৫-টায় বিনোদপুরস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।[১৭]

৪. মাওলানা আহমাদুল্লাহ রহমানী : মাওলানা আহমাদুল্লাহ রহমানী বাংলা ১৩২৯ সালের ১২ জ্যৈষ্ঠ (২৯ রামাযান) মুর্শিদাবাদের অদ্বতনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি পার্শ্ববর্তী ইসলামপুর গ্রামে মাওলানা নিযামুদ্দীনের কাছে আরবী ও ফার্সীর প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন। এরপর পশ্চিম দিনাজপুর ও বর্ধমানের উড়িষ্যায় পড়াশুনা করার পর দিল্লীর রহমানিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানে তিনি ভারতের খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম, তাফসীর ইবনে কাছীরের উর্দূ অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী প্রমুখের কাছে দরস গ্রহণ করেন। রহমানিয়া মাদরাসায় তিনি ড. আফতাব আহমাদ রহমানীর সহপাঠী ছিলেন। রহমানিয়া ও জামে'আ সালাফিয়া, বেনারস থেকে শিক্ষা গ্রহণ শেষে তিনি মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা ও সাদরদিঘী মাদরাসা, বিহারের আব্দুল্লাহপুর ও দিলালপুর এবং জামে'আ সালাফিয়া বেনারসে শিক্ষকতা করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি বাংলাদেশে চলে আসেন। ১৯৮০-২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ীতে মুহাদ্দিছ ও প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে কর্মরত ছিলেন। জীবনের দীর্ঘ সময় ব্যাপী তিনি ছহীহ বুখারীর দরস দেন। তিনি ২০০৮ সালের ২ মার্চ সকাল ৯-টায় চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার আলীনগরে নিজ বাসভবনে প্রায় ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[১৮]

৫. মাওলানা আব্দুল মুঈদ বেনারসী (আমীনুন নাহু ও আমীনুছ ছীগাহ গ্রন্থদ্বয়ের লেখক)। ৬. যায়নুল্লাহ তৈয়বপুরী ৭. 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল আব্দুল জলীল রহমানী (মৃঃ ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬) ৮. মুহাম্মাদ ইকবাল রহমানী ৯. মুহাম্মাদ আকিল রহমানী ১০. মুহাম্মাদ ইদরীস আযাদ রহমানী (মৃঃ ১৯৭৭ খৃঃ) ১১. আব্দুর রহীম বাস্তাবী ১২. মুহাম্মাদ যামান রহমানী ১৩. আব্দুস সালাম বাস্তাবী ১৪. মুহাম্মাদ খলীল রহমানী ১৫. হেকিম ওবায়দুল্লাহ রহমানী ১৬. আব্দুল কাইয়ূম বাস্তাবী ১৭. আহমাদুল্লাহ রহমানী দিলালপুরী ১৮. মুহাম্মাদ ইউসুফ রহমানী ১৯. আব্দুস সাত্তার রহমানী মালদহী ২০. মুহাম্মাদ মুসলিম রহমানী মালদহী (আব্দুল মতীন সালাফীর শিক্ষক) ২১. আব্দুল হাকীম মৌবী ২২. মুহাম্মাদ আবেদ রহমানী (জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাদরীসী খিদমাত গ্রন্থের লেখক) ২৩. মাওলানা আব্দুল হাই আনোয়ারী রহমানী (মৃঃ ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯০; গ্রামঃ শেরকোল, পোঃ নাসিরগঞ্জ, থানাঃ বাগমারা, রাজশাহী) প্রমুখ।

[চলবে]

১৭. *আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব কর্তৃক ড. রহমানীর কাছ থেকে শ্রুত ও বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত তথ্য; জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ২৬১; ড. মুহাম্মাদ শাহজাহান ও মো. শাহীদুর রহমান চৌধুরী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : ইতিহাস ও প্রতিভা (রাজশাহী : ২০০৬), পৃঃ ১৬২-৬৪; বার্ষিক প্রতিবেদন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫-৮৬, পৃঃ ১১১।*

১৮. *সাপ্তাহিক আরাফাত, বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ৩০, ১০ মার্চ ২০০৮, পৃঃ ৭-৮।*

www.at-tahreek.com

কবিতা

আঁধারে আলো

-মুহাম্মাদ শফীউদ্দীন
শিক্ষক (অবঃ), দক্ষিণ ভূএঞাপুর, টাঙ্গাইল।

আঁধার আঁধার চারিদিকে হায়
কোথা নাহি আলোকণা,
যেদিকে তাকাই দেখিবারে পাই
কেবলি উন্মাদনা।
নর-নারী সবে আঁধারেতে ডুবে
করিতেছে হাবুডুবু,
সবলেতে জোরে দুর্বলেরে ধরে
পীড়নে করিছে কাবু।
শুধু রণ-রণি অসি ঝনঝনি
নিয়ত আনিছে ত্রাস,
আরব মরুর বালুকার পর
মরণের হা হুতাশ।
আজি এ নিশিথে মিথ্যা নাশিতে
লৌহ-মাহ্ফূযের বাণী,
আসিল ভাসিয়া দিতে ভাসাইয়া
সকল অধর্ম গ্লানি।
সেই পুণ্যবাণী বিশ্ব বিমোহিনী
মুহাম্মাদ (ছাঃ) মুখ-মাঝে,
উঠিল ফুটিয়া সত্যকে লইয়া
অজ্ঞ আরবের মাঝে।
চারিদিকে আজি উঠিলরে বাজি
শান্তির বিজয় তান,
ধন্য ধন্য বলি বিশ্বের সকলি
গাহিল আল্লাহ্র গান।
হেরা হ'তে আনি কুরআনের বাণী
মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)
পশি নিজ ঘরে ডাকি খাদীজারে
কহিলেন এইমতে,
'নামূসুল আকবর' ফেরেশতা প্রবর
জিবরীল আসি হেরাতে।
মোরে জোরে ধরে পড়িবার তরে
চাপি মোর পেশানীতে,
তিনবার ধরি জ্যোতি বিস্তারি
ছাড়ি যান আকাশেতে।
এহেন জ্যোতির জ্বালায় অধীর
এসেছি তোমার গৃহে,
জড়ায়ে কম্বলে মোর দেহ কলে
সান্ত্বনা দিও স্নেহে।
এটাই সে আলো
যার প্রভায় আলোকিত হবে জাহান,
মানবতার মুক্তির তরে
দানিয়াছেন রহীম-রহমান।
***

একান্ত আকুতি

-মুহাম্মাদ আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

ওগো আমার রব, মালিক প্রভু
রহীম ও রহমান,
এ মহা বিশ্বের যত সৃষ্টি
সকলি তোমার দান।
আমার হস্ত আমার পদ
আমার দেহ ও মন,
তব ইবাদতে থাকে যেন রত
সদা ও সর্বক্ষণ।
শিরক ও বিদ'আত আছে যা বাতিল
নাহি যেন কভু মানি,
শক্তি দাও গো বাহু ও মনেতে
হিম্মত দাও মোরে দানি।
তব দেওয়া পথে চলিতে আমাকে
তুমি মোরে শক্তি দাও
আমার সত্তা জান্নাতের তরে
ক্রয় করিয়া লও!
দয়া করো মোরে ওগো দয়াময়
অধম বান্দার পর,
হয় না যেন কভু মমশির পরে
করুণার রুদ্ধ দ্বার।
এপার ওপার দু'পারে যেন
আপন তোমাকে পাই,
কবুল করো গো দীনের দো'আ
ওগো মালিক সাঁই।
***

অবাক লাগে

-মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন
মাহিগঞ্জ, রংপুর।

অফিস পিওন ছাহেব সাজে
কামাই করে টাকা,
জায়গা-জমি গাড়ি করে
বাড়ি করে পাকা।
বেতন যাহোক উপরি কামাই
অনেক টাকা আয়,
সারাক্ষণে খাই খাই ভাব
তাইতো চেহারায়।
গায়ের মানুষ মোড়ল বানায়
গভীর অনুরাগে,
এমন মানুষ দেখলে যে তাই
শুধুই অবাক লাগে।
***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ২। জাতীয় সংসদ।
৩। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিঃমিঃ।
৪। ৭টি। যথা- ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর। ৫। ৬টি। (রংপুর ব্যতীত)।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (গ্রীষ্মের ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১। পাখা-পা ২। গরম-গম ৩। পানি-পা
৪। বাতাস-তাস ৫। বিদ্যুৎ।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তরদাতাদের নাম :

রাজশাহী : সাদ্দাম, উবাইদা ও নাজমুল হুদা।
সাতক্ষীরা : আহমাদ সাজিদ (ওশান), আয়েশা ছিদ্দীকা সামিয়া।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (আন্তর্জাতিক)

১। জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব কে?
২। তিনি কোন দেশের নাগরিক?
৩। কোন মহাসচিব বিমান দুর্ঘটনায় নিহিত হন?
৪। জাতিসংঘের কার্যনির্বাহী প্রধান কে?
৫। জাতিসংঘের মহাসচিব কার সুপারিশে নির্বাচিত হন?

সংগ্রহে : ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১। ডাকাত এসে বাড়ি ঘিরল হাতে ছড়িছড়া
জানালা দিয়ে ঘর পালালো মালিক পড়ল ধরা।
২। তিন অক্ষরে নাম তার পানিতে বাস করে
সামনের অক্ষর বাদ দিলে আকাশেতে উড়ে।
৩। যতই আসুক বৃষ্টি-ঝড় আট কন্যার একটাই ঘর।
৪। তুমি আমি একজন দেখিতে একরূপ
আমি কত কথা বলি তুমি কেন চুপ।
৫। নয়া জামাই গোসল করে টুপি থাকে মাথার পরে
এক কলস পানি দাও তবু শুকনা তার গাও।

সংগ্রহে : বযলুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

সিংহমারা, মোহনপুর, রাজশাহী ৮ মে শনিবার : অদ্য বাদ যোহর সিংহমারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী (উত্তর) যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রাযযাক। অনুষ্ঠানে অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইমদাদুল হক্ব সহ এলাকা 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে সেখানে সোনামণি বালক ও বালিকা শাখা গঠন করা হয়।

বিরকয়া, বাগমারা, রাজশাহী ১২ মে বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় বিরকয়া উচ্চবিদ্যালয়ে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কাষ্টনাংলা ইবতেদায়ী মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা মুযযাম্মিল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সহকারী শিক্ষক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মনযুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মাওলানা মাযহারুল ইসলাম।

একই দিন বেলা সাড়ে ১২-টায় বিরকয়া ইসলামী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কাষ্টনাংলা ইবতেদায়ী মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা মুযযাম্মিল হক্ব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-এর সহকারী শিক্ষক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অনুষ্ঠানে অত্র বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আফযাল হুসাইন সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অত্র বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মাহবুবুর রহমান। অনুষ্ঠান শেষে অত্র বিদ্যালয়ে সোনামণি শাখা গঠন করা হয়।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২২ মে শনিবার : অদ্য বাদ আছর দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে সোনামণি'র উদ্যোগে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রাযযাক, অত্র শাখার সোনামণি প্রধান উপদেষ্টা হাফেয লুৎফর রহমান, উপদেষ্টা ও সোনামণি সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক গোলাম কিবরিয়া। পরিশেষে মারকাযে রজনীগন্ধা, হাসনাহেনা ও সূর্যমুখী নামক তিনটি শাখা পুনর্গঠন করা হয়।

বাগানপাড়া, সপুরা, রাজশাহী ২৫ মে মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর বাগানপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক গোলাম কিবরিয়া ও অত্র মসজিদের দায়িত্বশীল আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুলতান মাহমূদ।

যেলা গঠন

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ৫ মে বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরায় এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে ২০০৯-২০১১ সেশনের সোনামণি সাতক্ষীরা যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হুসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শাহীদুযযামান ফারূক, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুযাফ্ফর হুসাইন প্রমুখ। পরদিন শপথ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ।

পরিচালনা পরিষদ

ক্র.	নাম	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১	মাওলানা আব্দুল মান্নান	প্রধান উপদেষ্টা	এম.এম,এম.এ
২	মুহাম্মাদ শাহীদুযযামান ফারূক	উপদেষ্টা	এম.এম,এম.এ
৩	আব্দুল্লাহ আল-মামূন	পরিচালক	এইউ,বি.এ
৪	লুৎফর রহমান	সহ-পরিচালক	এম.এম,বি.এ
৫	মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান	”	বি.এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ
৬	ওয়ালিউর রহমান	”	ফাযিল
৭	মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম	”	বি.এ (অনার্স) ১ম বর্ষ

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন : বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের অভাবনীয় সাফল্য

বাংলাদেশের একদল বিজ্ঞানী পাটের জীবনরহস্য বা জিন নকশা (জিনোম সিকোয়েন্স) উন্মোচন করেছেন। এর ফলে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও প্রয়োজন অনুযায়ী পাটের নতুন জাত উদ্ভাবন করা যাবে। পাটের গুণগত মান ও বিপুল মাত্রায় উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, নতুন জাত উদ্ভাবন করা হ'লে পানিতে জাগ দেওয়ার সময় কম লাগবে, আঁশ দিয়ে জৈব জ্বালানী ও ওষুধ তৈরী করা সম্ভব হবে।

বিশ্বের প্রাণরসায়ন গবেষণায় পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন একটা অভাবনীয় অর্জন। বিশ্বে এ পর্যন্ত ১৭টি উদ্ভিদের জীবনরহস্য উন্মোচিত হয়েছে। এই প্রথম বাংলাদেশের মতো কোন উন্নয়নশীল দেশের বিজ্ঞানীরা একাজে বড় সাফল্য অর্জন করলেন। পাটের জীবনরহস্য উন্মোচনের গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন মালয়েশিয়া প্রবাসী বাংলাদেশী বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম। ২০০৮ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে পেঁপে ও ২০০৯ সালে মালয়েশিয়া সরকারের হয়ে রাবারের জীবনরহস্য উন্মোচনের গবেষণায় নেতৃত্ব দেন। পাটের জীবনরহস্য উন্মোচিত হয় বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) ও বেসরকারী তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সংস্থা 'ডাটা সফট' যৌথভাবে গবেষণার কাজটি করেছে। ২০০৮ সালে দেশের ৪২ জন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদকে নিয়ে তৈরী 'স্বপ্নযাত্রা' নামক একটি উদ্যোগের মাধ্যমে এই গবেষণার সূত্রপাত। পরে ২০১০ সালে নতুন উদ্যমে আবারও গবেষণাটি শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অণুজীব বিভাগের ১১ জন গবেষক ও ডাটা সফটের ২০ জন তথ্যপ্রযুক্তিবিদ তথ্য বিশ্লেষণের কাজগুলো করেছেন। মাকসুদুল আলম বলেন, 'গবেষণার একটি স্তর আমরা শেষ করেছি। পরবর্তী বীজ তৈরির আগ পর্যন্ত আমাদের আরও নিষ্ঠার সাথে সবাই মিলে কাজটি করতে হবে। ভবিষ্যতে এমন জাতের পাঠ উদ্ভাবন করা সম্ভব, যার আঁশ দিয়ে জৈব জ্বালানী তৈরী করা যাবে। এতে দেশের জ্বালানী সমস্যার সমাধানও অনেকাংশে সম্ভব হবে'।

২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেট

দেশীয় শিল্প, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহীত গত ১০ জুন আগামী ২০১০-১১ অর্থবছরের জন্য ১ লাখ ৩২ হাযার ১৭০ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট পেশ করেছেন। যা জিডিপির প্রায় ১৭ শতাংশ। এটি দেশের ৩৯তম বাজেট। প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৯২ হাযার ৮৪৭ কোটি টাকা, যা জিডিপির ১১.৯ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সূত্রের কর থেকে ৭২ হাযার ৫৯০ কোটি টাকা, রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত সূত্র থেকে ৩ হাযার ৪৫২ কোটি টাকা এবং কর বহির্ভূত খাত থেকে ১৬ হাযার ৮০৫ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাজেটে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৩৯ হাযার ৩২৩ কোটি টাকা, যা জিডিপির ৫ শতাংশ। ঘাটতি পূরণে বৈদেশিক সূত্র থেকে ১৫ হাযার ৬৪৩ কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে ২৩ হাযার ৬৮০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হবে। বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) ধরা হয়েছে ৩৮ হাযার ৫শ' কোটি টাকা এবং রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৫ হাযার ২৩০ কোটি টাকা। বরাবরের মতো এবারের বাজেটেও কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রয়েছে।

সর্বোচ্চ বরাদ্দ শিক্ষাখাতে : শিক্ষাকে দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের অন্যতম কৌশল হিসাবে গ্রহণ করে শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তাবিত বাজেটে এ খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে ১৭ হাযার ৯৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এ বরাদ্দ গত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে শতকরা ১৩.৫ শতাংশ বেশী।

যেসব জিনিসের দাম বাড়বে : ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে আমদানী শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি এবং নতুনভাবে করারোপের কারণে বেশকিছু পণ্য ও সেবার দাম বাড়বে। যেসব জিনিস ও সেবার দাম বাড়বে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- মোটরগাড়ি (১০০১ সিসি থেকে ১৫০০ সিসি), মাইক্রোবাস (১৮শ' সিসি পর্যন্ত), পেপার ববিন, আমদানীকৃত টেলিভিশন যন্ত্রাংশ, মনোফিলামেন্ট রড, ডিজেল ইঞ্জিন, সাদা প্রিন্টিং পেপার, ব্লেড, সিগারেট, জর্দ্দা, গুল, টাইলস, মোজাইক, শ্যাম্পু, মিনারেল ওয়াটার (তিন লিটার পর্যন্ত), বিজ্ঞাপনী সংস্থা, ছাপাখানা, কুরিয়ার সার্ভিস, অডিট ও একাউন্টিং ফার্ম, গ্রাফিক ডিজাইনার, আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও ইনটেরিয়র ডিজাইনার প্রভৃতি।

যেসব জিনিসের দাম কমবে : যেসব পণ্যের দাম কমতে পারে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, গুঁড়া দুধ, নারিকেল তেল, সিএনজি অটোরিক্সা, টেম্পো, দেশে উৎপাদিত রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, মোটরসাইকেল, প্রিন্টার, টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি, টিনের পাত্র, প্লাস্টিক লেন্স প্রভৃতি।

বাজেট প্রতিক্রিয়া : এবারের বাজেট নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, অর্থনীতিবিদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞরা বিভিন্নমুখী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি প্রস্তাবিত বাজেটকে 'উচ্চবিলাসী' 'লুটপাট' ও 'ডিজিটাল মারপ্যাঁচের অস্পষ্ট বাজেট' বলে আখ্যায়িত করেছে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) প্রস্তাবিত বাজেটকে নীতি ও দর্শনের দিক থেকে গতানুগতিক এবং ধনিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার দলীল হিসাবে অভিহিত করেছে। অনেকেই বাজেটকে বড় আকারের আখ্যায়িত করে এটি বাস্তবায়ন করা দুঃসাধ্য ও চ্যালেঞ্জ বলে মন্তব্য করেছেন। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা বাজেটকে 'শিল্পবান্ধব' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

৮ মাত্রার ভূমিকম্প হ'লে ঢাকার ২৮ ভাগ ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়ে যাবে

৮ মাত্রার ভূমিকম্প হ'লে ঢাকার ২৮ ভাগ ঘরবাড়ী ধ্বংস ও লক্ষাধিক মানুষের প্রাণহানির আশংকা করছেন গবেষকরা। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৯০টি ওয়ার্ডের ঘরবাড়ির পরিস্থিতি ও

জনসংখ্যার ঘনত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'সম্ভাব্য ভূমিকম্পে ঢাকা শহরের সম্পদ ধ্বংস ও জীবনহানি নির্ধারণ' শীর্ষক গবেষণায় বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) প্রফেসর ড. মেহেদী আহমাদ আনছারী এবং মিলিটারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর কর্নেল গাযী ফিরোয রহমান এসব তথ্য জানান। গবেষণায় তারা বলেন, ঢাকার ৯০টি ওয়ার্ডে ৬০ লাখেরও বেশী লোক বাস করে। ৮ মাত্রার ভূমিকম্প হ'লে ৩ দশমিক ৭ ভাগ লোকের মৃত্যুর ঝুঁকি রয়েছে। এ সংখ্যা হবে কমপক্ষে এক লাখ। তবে ভূমিকম্প সকালে হ'লে ৭৭ হাযার, রাতে হ'লে ৯৭ হাযার এবং দুপুরে হ'লে ৫৪ হাযার লোকের প্রাণহানির আশংকা রয়েছে। একই সঙ্গে আহত হবে যথাক্রমে এক লাখ ১০ হাযার, ১ লাখ ২৬ হাযার এবং ৬৯ হাযার। উল্লেখ্য, ঢাকায় বাড়ীঘর আছে আড়াই লাখের মতো।

ঢাকার ৬৫ ভাগ মাটি বহুতল ভবনের উপযোগী নয় : রাজধানীর ৬৫ শতাংশ এলাকার মাটির গুণগত মান বহুতল ভবন নির্মাণ করার উপযুক্ত নয়। এসব এলাকার মাটিতে ছয় তলার বেশী উঁচু ভবন নির্মাণ করা হ'লে তা যেকোন সময় উপড়ে বা হেলে পড়তে পারে। এমনকি নীচে দেবে যাওয়ার আশংকাও আছে। ঢাকা শহরের মাটির মানের এ চিত্র বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের গবেষণায় উঠে এসেছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি অনুমোদন; বহাল থাকছে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা

গত ৩১ মে মন্ত্রীসভার বৈঠকে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া অনুমোদিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকে প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক ও সর্বজনীন করে শিক্ষানীতি ২০১০-এর খসড়া অনুমোদন করা হয়। শিক্ষানীতিতে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি বহাল রেখে মাধ্যমিক স্তর ৯ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত করা এবং সব ধারার শিক্ষায় কিছু অভিন্ন বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো, মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি নির্দিষ্ট শ্রেণীর পাঠ্যসূচী বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষানীতির আলোকে বর্তমান প্রচলিত ডিগ্রি (পাস) কোর্স ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে এটিকে অনার্স কোর্সে পরিণত করা হবে। প্রাথমিক স্তরে প্রথম শ্রেণীর আগে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের জন্য থাকছে এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। পঞ্চম শ্রেণীর ফলাফলের উপর বৃত্তির ব্যবস্থা থাকবে।

২০১২ সালের এইচএসসি পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে হবে : ২০১২ সালে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় বাংলা ১ম পত্র বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রশ্নের মানবণ্টন হবে সৃজনশীল প্রশ্ন-৬০ এবং বহু নির্বাচনী প্রশ্ন-৪০। গত ৭ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারী করা এক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, এর পরবর্তী বছর থেকে পর্যায়ক্রমে অন্য বিষয়গুলোকে সৃজনশীল পদ্ধতির আওতায় আনা হবে।

তিন বছরে দেশে ৬ লাখ বেকার ও ৪২ লাখ আধা বেকার বেড়েছে

বাংলাদেশে গত তিন বছরে বেকার ও আধা বেকারের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। একই সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে দিনমজুরের সংখ্যা। 'বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র ২০০৯ সালের জরিপ থেকে জানা গেছে যে, ২০০৬ সালে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার যেখানে ৪.৩ শতাংশ ছিল, সেখানে ২০০৯ সালে তা ৫.১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এই তিন বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা ২১ লাখ থেকে ২৯ শতাংশ বেড়ে ২৭ লাখে উন্নীত হয়েছে। ২০০৬ সালে আধা বেকারের সংখ্যা ছিল দুই কোটি ৪৫ লাখ। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে এ সংখ্যা দুই কোটি ৮৭ লাখে উন্নীত হয়েছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপে আরো দেখা যায়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষি খাতে কর্মরতদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ২০০৬ সালে যেখানে মোট শ্রমশক্তির ৪৮.১ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত ছিল, সেখানে ২০০৯ সালে কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির সংখ্যা নেমে আসে ৪৩.৬ শতাংশে।

ফারাক্কা পয়েন্টে এবার দেড় লাখ কিউসেক পানি কম পেয়েছে বাংলাদেশ

গঙ্গার পানি বণ্টন নিয়ে ৩০ বছর মেয়াদী চুক্তি অনুযায়ী ফারাক্কা পয়েন্টে মোট ১৫ কিস্তিতে প্রায় ১ লাখ ৪৬ হাযার কিউসেক পানি কম পেয়েছে বাংলাদেশ। চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ এই পরিমাণ পানি কম পেয়েছে ভারত থেকে। যৌথ নদী কমিশন সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছর ১৫ কিস্তির মধ্যে বাংলাদেশ ছয় লাখ ২২ হাযার ১৫৭ কিউসেক পানি পাওয়ার দাবীদার ছিল। কিন্তু ১৫টি কিস্তিতে বাংলাদেশ পেয়েছে চার লাখ ৭৬ হাযার ৫৬ কিউসেক। অর্থাৎ ১৫ কিস্তিতে এক লাখ ৪৬ হাযার এক কিউসেক পানি কম পেয়েছে বাংলাদেশ।

পুরান ঢাকায় স্মরণকালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত ১২১

৩ জুন বৃহস্পতিবার রাত ৮-টা। পুরান ঢাকার নিমতলীর নবাবকাটরা রোডের ৪৩/৩ নম্বর বাড়ীতে রুনা নামক এক মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান। চলছিল মেহমানদের জন্য নানা পদের রান্নার কাজ। হঠাৎ আগুনের লেলিহান শিখা দৃশ্যপট পরিবর্তন করে দিল। মানুষের আর্তচিৎকারে পুরান ঢাকার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠল। আগুন, অন্ধকার ও ধোঁয়ায় অকুস্থলের ভবনগুলো পরিণত হ'ল মৃতুকূপে। জীবন বাঁচানোর জন্য মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা হ'ল না। নিজের চোখের সামনে সন্তান বাবা-মা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনকে দগ্ধীভূত হ'তে দেখেও তাদেরকে উদ্ধার করতে পারল না লেলিহান অগ্নিশিখার কারণে। মুহূর্তেই পুরান ঢাকার নিমতলী শোকের চাদরে আবৃত হ'ল। এ মর্মান্তিক ট্যাজেডিতে সর্বমোট নিহত হয় ১২১ জন। আহত দু'শতাধিক। নিহতদের মধ্যে একই পরিবারের সাত সদস্যও রয়েছেন। আছেন বিয়ে বাড়ীতে আসা একই পরিবারের প্রায় অর্ধশত আত্মীয়-স্বজন। আহতরা এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থেকে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এক অব্যক্ত দুঃসহ বেদনা আর আত্মীয়-স্বজনের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার করুণ স্মৃতি তাদের তাড়া করে ফিরছে প্রতিনিয়ত। পুরনো ঢাকার সরু রাস্তার কারণে দমকল বাহিনী প্রায় ৪ ঘণ্টা পর অকুস্থলে পৌঁছায়। এতে

ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণও বেড়ে যায়। এ অগ্নিকাণ্ডে এক কোটি ৬৮ লাখ ৫৫ হাযার টাকা মূল্যের সম্পদের ক্ষতি হয়।

যেভাবে ঘটে অগ্নিকাণ্ড : সরকারী প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে যে, বিয়ে বাড়ির সিঁড়িকোঠায় দীর্ঘ সময় ধরে রান্নার কাজ চলায় তা থেকে সৃষ্ট তাপ গুদামে সংরক্ষিত রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে যায় এবং দ্রুত পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। জ্বলন্ত রাসায়নিক দ্রব্য ট্রান্সফরমারের নীচে রাস্তায় থাকা মোটরসাইকেলে এসে লাগলে তাতে আগুন ধরে যায়। আগুন এতই তীব্র ছিল যে বাড়ির গ্যাসের পাইপ পুড়ে যায়। নিগর্ত গ্যাস আগুনের সংস্পর্শে এসে আরও ভয়াবহতার সৃষ্টি করে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন দু'টি ট্রান্সফরমারে ছড়িয়ে পড়লে বিকট শব্দে বৈদ্যুতিক স্পার্কের সৃষ্টি হয় এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফায়ার সার্ভিসের তদন্ত রিপোর্টেও কেমিক্যালের কারণে এ ঘটনা ঘটেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারী তদন্ত কমিটির মতে, গুদামে যে রাসায়নিক দ্রব্য রাখা হয়েছিল তার নাম এনএন ডাই নাইট্রোসো পেন্টামিথিলিন টেট্রামিন (ডিএনপিটি)। এটি থেকে একটু গ্যাস বের হ'লে তাতে আগুন লেগে যায় এবং ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার জন্য দায়ী : এ ধরনের বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য বসতবাড়ির নীচে অবৈধভাবে গুদামজাত করার জন্য ব্যবসায়ী অহিদুল্লাহ মজুমদার এবং বাড়ির মালিক মুহাম্মাদ গুলযার, মুহাম্মাদ দিদার ও মুহাম্মাদ ফারূককে দায়ী করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছে সরকারী তদন্ত কমিটি। উল্লেখ্য, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ইকবাল খান চৌধুরী ছিলেন সরকারী তদন্ত কমিটির প্রধান।

চৌদ্দগ্রামে প্রথম সীমান্ত পর্যবেক্ষণ টাওয়ার স্থাপন

দেশে প্রথমবারের মতো কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের গোমারবাড়ি সীমান্তে স্থাপন করা হয়েছে বর্ডার সেন্ট্রি পোস্ট (বিএসপি) নামে সীমান্ত রক্ষা পর্যবেক্ষণ টাওয়ার। এতে ব্যয় হয়েছে এক লাখ ৭৫ হাযার টাকা। স্থানীয় দু'জন জমির মালিক নিষ্কণ্টকভাবে এ টাওয়ারের জমিটি দান করেছেন।

চার ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে ঢাকার চার লাখ ভবন

৫৯০ বর্গমাইলের রাজধানী ঢাকার মোট ভবনের সংখ্যা বুয়েটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় তিন লাখ এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) হিসাবে চার লাখ। নগর পরিকল্পনাবিদদের মতে, এর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের সংখ্যা ৭০ হাযার, ২০০৪ সালের ২১ নভেম্বর প্রকাশিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের জরিপ মতে ২৫ হাযার, বুয়েটের আরবান ও রিজিওনাল প্লানির বিভাগের প্রতিবেদন মতে প্রায় চার হাযার এবং রাজউক-এর মতে তিন হাযার ৮৮৫টি। জানা গেছে, ঢাকার ৮টি জোনে অবস্থিত চার লাখ ভবনের আইনানুগ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব রয়েছে মাত্র চারজন অথরাইজড অফিসারের উপর। অর্থাৎ গড়ে প্রতি জনের ভাগে রয়েছে এক লাখ ভবন। নির্মাণ-পূর্ব ভবনের ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র, নকশা অনুমোদন, নকশাবহির্ভূত ভবন চিহ্নিতকরণ এবং উচ্ছেদের আইনগত অনুমোদন এসব কিছুর দায়িত্বই অথরাইজড অফিসারের ওপর।

বিদেশ

সন্তানের সঙ্গে বন্ধন বাড়াতে বৃটিশ মায়েদের জন্য সরকারী বরাদ্দ

সন্তান লালনপালন করার জন্য ব্রিটেনের অসচ্ছল মায়েরা সরকারের কাছ থেকে প্রায় ১ লাখ পাউন্ড অর্থ বা বিভিন্ন সহযোগিতা পেয়ে থাকেন। তবে সেটা তাঁরা পান সন্তানের ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে। কিন্তু সন্তানের সঙ্গে মায়ের বন্ধন আরও জোরদার করতে নতুন প্রস্তাব দিয়েছেন লেবার দলের এক এমপি। ফ্রাঙ্ক ফিল্ড নামে ঐ এমপির প্রস্তাব অনুযায়ী সন্তানের প্রথম দুই বছর বয়সের মধ্যে ঐ অর্থের এক-চতুর্থাংশ অর্থ ২৫ হাযার পাউন্ড দিতে হবে। তাহ'লে সন্তান জন্মের পর আবার কাজে ফিরে যাওয়ার জন্য মায়েদের তাড়া থাকবে না। এতে মায়েরা বাড়ীতে সন্তানকে আরও বেশী সময় দিতে পারবেন। সন্তানের সঙ্গে তাঁদের বন্ধন আরও জোরালো হবে। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বরে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মা কাজে থাকেন তাঁদের সন্তানের স্বাস্থ্য বাড়ীতে থাকা মায়েদের সন্তানের স্বাস্থ্যের চেয়ে খারাপ।

ইসরাঈলী নারী বিয়ে করলে মিসরে নাগরিকত্ব বাতিল

কোন মিসরীয় ইসরাঈলী নারী বিয়ে করলে তার নাগরিকত্ব বাতিল করার পক্ষে রায় দিয়েছে মিসরের সুপ্রিম কোর্ট। মিসরের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ সংক্রান্ত একটি আবেদন ৫ জুন খারিজ করে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখে দেশটির সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়, ইসরাঈলের আরব নাগরিক ও ইসরাঈলের ইহুদী নাগরিককে বিয়ে করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রায়ে বলা হয়, ইসরাঈলী আরব তথা ফিলিস্তীনী মেয়েদের বিয়ে করতে পারবে মিসরীয় পুরুষরা। এতে বলা হয়, ইসরাঈলী ইহুদী নারী ও দখলদারিত্বের আওতায় বসবাসকারী আরবদের মেয়েদের বিয়ে করার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

সর্বোচ্চ আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের আর কোন সুযোগ না থাকলেও কারো নাগরিকত্ব বাতিলের আগে তা মিসরীয় সরকারের কাছে উপস্থাপন করতে হবে, সেখানেই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ইসরাঈলী নারীদের বিয়ে করা মিসরীয় ব্যক্তির সংখ্যা ৩০ হাযার। এদের মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ আরব ইসরাঈলীদের বিয়ে করেছে।

ভারতে মাওবাদীদের হামলায় ৫ বছরে নিহত ২৬৭০ জন

২০০৫ সাল থেকে ভারতে মাওবাদীদের হাতে নিহত হয়েছেন ২৬৭০ জন। এর মধ্যে সাধারণ নাগরিক ১৬৮০ জন এবং নিরাপত্তাকর্মী ৯৯০ জন। গড়ে প্রতি ২ দিনে মাওবাদীরা খুন করছে ৩ জনকে। উল্টো দিকে গত পাঁচ বছরে প্রাণ হারিয়েছে ১৪৪০ জন মাওবাদী। ২০১০ সালে মাওবাদীদের শিকার ৪৬০ জন। এর মধ্যে নিরাপত্তাকর্মী ১৬৭ জন।

মার্কিন ঘাঁটি বন্ধে ব্যর্থতার দায়ে জাপানী প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ; কান নয়া প্রধানমন্ত্রী

জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী নাওতো কান (৬৩)। তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইউকিয়ো হাতোয়ামার স্থলাভিষিক্ত হ'লেন।

ওকিনাওয়া দ্বীপের মার্কিন বিমান ঘাঁটি বিতর্কে ২ জুন হাতোয়ামা পদত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, হাতোয়ামা গত নির্বাচনী প্রচারণার সময় এ ঘাঁটিটি বন্ধের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। গত ৪ জুন জাপানী পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের ভোটাভুটিতে কানকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত করেন পার্লামেন্ট সদস্যরা। ৪৭৭টি বৈধ ভোটের মধ্যে কান পান ৩১৩টি। পরে পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে ২৩৭ ভোটের মধ্যে ১২৩ ভোট পেয়ে কান তার প্রধানমন্ত্রীত্ব নিশ্চিত করেন।

ব্রিটেনের পারমাণবিক বোমার সংখ্যা ১৬০টি

ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম হেগ জানান, সেদেশে পূর্ণ কর্মক্ষম ১৬০টি আণবিক বোমা রয়েছে। আরও কিছু বোমা আপাতত নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে দেশটি তার আণবিক অস্ত্রের সংখ্যা ২২৫-এ সীমিত রাখতে চায়।

জাতিসংঘ রিপোর্ট

বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের ড্রোন হামলা ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে

ড্রোন বিমানের মত অস্ত্র ব্যবহার করে গণহত্যা পরিচালনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন জাতিসংঘ কর্মকর্তা ফিলিপ অ্যালস্টন। তিনি বলেন, ড্রোন বিমানের সাহায্যে বেসামরিক লোকজনকে পাইকারীভাবে হত্যা করে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করছে এবং বিশ্বে আইনের শাসনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করছে। তিনি আরো বলেন, ড্রোন হামলা চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিশেষভাবে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারকে হরণ করছে। যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহতভাবে ড্রোন হামলার কারণে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ধীরে ধীরে কম্পিউটার গেম হিসাবে বিবেচিত হবে বলে জাতিসংঘের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বিষয়ক বিশেষ দূত ফিলিপ অ্যালস্টন আশংকা ব্যক্ত করেছেন। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে তিনি তাঁর এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের দেনার পরিমাণ ১৩ ট্রিলিয়ন ডলার

যুক্তরাষ্ট্রের দেনা বর্তমানে ১৩ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশী। দেশটির ইতিহাসে এত বেশী দেনা এবারেই প্রথম। মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।

চীনের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ সবচেয়ে বেশী : বিশ্বের সেরা পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র চীনের কাছে বিশাল অংকের অর্থ ঋণ নিয়েছে। চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত মেয়াদে চীন ৯০ হাযার ২০ কোটি ডলারের মার্কিন ট্রেজারি বন্ড ক্রয় করে। যুক্তরাষ্ট্রকে ঋণদাতা দেশ হিসাবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জাপান আর তৃতীয় স্থানে রয়েছে ব্রিটেন। এপ্রিল পর্যন্ত মেয়াদে জাপান ৭৯ হাযার ৫০ কোটি ডলার এবং ব্রিটেন ২৩ হাযার ৯৩ কোটি ডলারের মার্কিন ট্রেজারি বন্ড ক্রয় করেছে।

নেদারল্যান্ডে বিশ্বের বৃহত্তম রেডিওটেলিস্কোপ স্থাপন

নেদারল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা গত ১২ জুন বিশ্বের বৃহত্তম রেডিওটেলিস্কোপ চালু করে বলেছে, এটি 'বিগ ব্যাংক'-এর মতো বহু দূরের দুর্বল সংকেত ধারণ করতে সক্ষম। দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর এসেনের কাছে ঐ টেলিস্কোপ বসানো হয়েছে। নেদারল্যান্ডের রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি ইন্সটিটিউটের ফেমকি বোয়েখোট জানান, লোফার (লো ফ্রিকোয়েন্সি এরে) এ ৫০ সেন্টিমিটারের মধ্যে ২৫ হাযার ক্ষুদ্র এন্টেনা সংযোজন করা হয়েছে এবং দুই মিটার দূরে প্রচলিত বৃহৎ ডিস বসানো হয়েছে। তবে অ্যান্টেনাগুলো পুরো নেদারল্যান্ড এমনকি জার্মানি, সুইডেন, ফ্রান্স ও ব্রিটেনেও ছড়ানো রয়েছে। যখন সম্মিলিতভাবে অ্যান্টেনাগুলো যুক্ত হবে তখন এটি একটি বৃহত্তম টেলিস্কোপে পরিণত হবে এবং এর ডায়ামিটার দাঁড়াবে প্রায় এক হাযার কিলোমিটার।

ইয়েমেনে ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার করেছে যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্র ইয়েমেনে গত ডিসেম্বর মাসে আল-কায়েদা বিরোধী অভিযানের সময় ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ করেছে। এতে ৫৫ জন মারা যায়, যাদের বেশিরভাগই সাধারণ নাগরিক। মানবাধিকার সংস্থা 'অ্যামনেস্টি' জানায়, গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় আবিয়ান প্রদেশের আল-মাজালায় হামলার সময় এ জাতীয় বোমা ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র। অ্যামনেস্টির অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ গবেষক মাইক লিইস জানান, ইয়েমেনে এ ধরনের বোমা ব্যবহারের প্রমাণ পেয়ে অ্যামনেস্টি ভীষণ উদ্বিগ্ন। ক্লাস্টারের মতো বোমার একটি ভয়ংকর বিপজ্জনক দিক হচ্ছে এগুলো অবিস্ফোরিত অবস্থায় বছরের পর বছর জীবনের জন্য বিস্ফোরণের ঝুঁকি হয়ে থাকে।

ত্রাণবাহী জাহাজে ইসরাঈলী বর্বর আক্রমণ

অবরুদ্ধ গাযার পথে তুর্কী ত্রাণসামগ্রী বহনকারী জাহাজে ইসরাঈলী নৌবাহিনী হামলা চালায় গত ৩১ মে সকাল ৫-টার সময়। এতে ২০ জন নিহত ও অর্ধ শতাধিক আহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৯ জন তুরস্কের নাগরিক। গাযার সমুদ্র তীরের ১৫০ কিলোমিটার দূরে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। প্রায় ৭০০ যাত্রী ও ১০ হাযার টন ত্রাণসামগ্রী নিয়ে জাহাজগুলো সাইপ্রাসের দক্ষিণাঞ্চলীয় একটি সমুদ্রবন্দর থেকে ছেড়ে আসে। ফিলিস্তীনী একটি গ্রুপ ও তুরস্কের একটি মানবাধিকার সংস্থার উদ্যোগে ত্রাণসামগ্রী গাযায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হচ্ছিল। গাযা উপকূল থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার দূরে ইসরাঈলী কমান্ডোরা হেলিকপ্টার থেকে তুরস্কের মাভি মারমারা নামক যাত্রীবাহী জাহাজে নেমেই যাত্রীদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো শুরু করে। তবে ইসরাঈল বলেছে, প্রাণসংহারী ও সহিংস আচরণের কারণেই নৌসেনারা গুলী চালাতে বাধ্য হয়। তারা অজুহাত দেখিয়ে বলেছে, জাহাজটি এমন কিছু দ্রব্য বহন করছিল যা হামাস ব্যবহার করে ইসরাঈলের দিকে রকেট নিক্ষেপের কাজে।

এ ন্যক্কারজনক আক্রমণের প্রতিবাদে গোটা বিশ্ব ফুঁসে উঠেছে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এ হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে এবং একে 'গণহত্যা'র শামিল দাবী করে ইসরাঈলকে সমুচিত শাস্তি দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু ইসরাঈল এ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে অস্বীকার এবং জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক তদন্তের আহ্বানকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নামকাওয়াস্তে ৩ সদস্য বিশিষ্ট নিজস্ব তদন্ত কমিশন গঠন করেছে আইওয়াশ করার জন্য। উল্লেখ্য, গত তিন বছর ধরে ইসরাঈল গাযা অবরোধ করে রেখেছে।

মুসলিম জাহান

আফগানিস্তানে খনিজসম্পদের বিশাল ভাণ্ডার আবিষ্কার

কিছুদিন আগেও গযনীকে মনে হ'ত বিবর্ণ একটি প্রদেশ। কিছুই নেই, শুধু হাহাকার। কিন্তু পেন্টাগনের জরিপে দেখা যাচ্ছে, এখানেই লিথিয়ামের বৃহত্তম ভাণ্ডারটি অবস্থিত। শুধু লিথিয়াম নয়, লোহা, তামা, কোবাল্ট, স্বর্ণ ও লিথিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজসম্পদের বিশাল বিশাল ভাণ্ডার আবিস্কৃত হয়েছে দেশটিতে। প্রাথমিক হিসাবে এসব সম্পদের মূল্য প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলার। তবে আফগান সরকারের মতে তিন ট্রিলিয়ন ডলার। এসব খনিজের অনেকগুলো আধুনিক শিল্পের অপরিহার্য উপাদান। পেন্টাগনের কর্মকর্তা ও মার্কিন ভূতাত্ত্বিকদের একটি ক্ষুদ্র দল এই বিশাল ভাণ্ডারের সন্ধান পায়। মার্কিন কর্মকর্তাদের মতে, আফগানিস্তান বিশ্বের অন্যতম খনিজ কেন্দ্রে পরিণত হ'তে পারে। একটি মার্কিন দলীলে বলা হয়েছে, আফগানিস্তান 'লিথিয়ামের সঊদী আরবে' পরিণত হ'তে পারে। সোডিয়াম সদৃশ নরম ধাতব পদার্থ লিথিয়াম ল্যাপ্টপ ও মোবাইল ফোনের ব্যাটারী তৈরীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, গযনী প্রদেশে লিথিয়ামের যে ভাণ্ডার রয়েছে, তা বলিভিয়ার সমপরিমাণ। বলিভিয়া বিশ্বের সর্বাধিক লিথিয়ামের মালিক বলে ধারণা করা হয়।

জেরুযালেমের বেশির ভাগ ফিলিস্তীনির বাস দারিদ্র্যসীমার নীচে

পূর্ব জেরুযালেমের প্রতি চারজন শিশুর তিনজনই দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। মানবাধিকার সংগঠন 'অ্যাসোসিয়েশন ফর সিভিল রাইটস ইন ইসরাঈল' (এসিআরআই) বলেছে, পূর্ব জেরুযালেমে ৭৫ শতাংশ ফিলিস্তীনী শিশু দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে, যেখানে ইহুদী শিশুর ক্ষেত্রে এ হার ৪৫ শতাংশ। এছাড়া ৯৫ হাযারেরও বেশী শিশু স্থায়ী দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে।

দুই কাশ্মীরই এখন স্বাধীনতা চায়

ব্রিটিশ ভারতের দেশীয় রাজ্য কাশ্মীর এখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে আছে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে। ভারতীয় অংশের নাম জম্মু ও কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের অংশের নাম আযাদ কাশ্মীর। ভারত বিভাগের সময় অন্য দেশীয় রাজ্যগুলো হিন্দুপ্রধান হওয়ায় সেগুলো ভারতের সঙ্গেই মিশে যায়। কাশ্মীরের অধিবাসীরা মূলত মুসলমান। তবে তাদের রাজা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ায় সাধারণ মানুষের পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তির দাবীকে অগ্রাহ্য করে হিন্দু রাজা ভারতের সঙ্গে মিশে যান। বর্তমানে ব্রিটিশ একাডেমী পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, শুধু যে ভারতীয় কাশ্মীরীরাই স্বাধীনতা চাইছে তা নয়। স্বাধীনতার কামনা মনে মনে পোষণ করছে আযাদ কাশ্মীরের জনগণও। পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীরীদের মধ্যে শতকরা ৪৪ জন আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চান আযাদ কাশ্মীরকে। আর জম্মু কাশ্মীরের স্বাধীনতা চায় ৪৩ ভাগ।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কোপার্নিকাস বীরের মর্যাদায় ফের সমাহিত

সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র পৃথিবীর চারপাশে নয়; বরং পৃথিবীই সূর্যের চারপাশে ঘোরে এই যুগান্তকারী আবিষ্কার করে ক্যাথলিক চার্চের চরম তিরস্কারের মুখে পড়েছিলেন পোল্যান্ডের জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপার্নিকাস। মৃত্যুর পর নাম-পরিচয়হীনভাবে অবহেলায় কবর দেওয়া হয় তাঁকে। তাঁর মৃত্যুর প্রায় ৫০০ বছর পর গত ২১ মে কোপার্নিকাসকে বীরের মর্যাদায় পুনরায় সমাধিস্থ করেছে পোলিশ ক্যাথলিক চার্চ।

কোপার্নিকাস ক্যাথলিক চার্চের কর্মকর্তা ও চিকিৎসকের দায়িত্বও পালন করতেন। জ্যোতির্বিদ হিসাবে তখন তিনি একেবারেই অপরিচিত ছিলেন। সে সময় প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল পৃথিবী সারা বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। কিন্তু কোপার্নিকাস দাবী করেন, পৃথিবীই সূর্যকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। এই তত্ত্বের জন্য তৎকালীন চার্চ কোপার্নিকাসকে বিপথগামী আখ্যা দিয়ে চরম নিন্দা করে। ১৫৪৩ সালে মৃত্যুর পর পোল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলে ফামবর্ক নামক স্থানে কোনো নামফলক ছাড়াই কবর দেওয়া হয় তাঁকে। কোপার্নিকাসের মৃত্যুর পর ইতালীয় জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও তাঁর তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণ করেন। কোপার্নিকাসের লেখা 'অন দ্য রেভল্যুশনস অব দ্য হেভেনলি সিয়ারস' বইটিকে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার সূচনাবিন্দু বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা।

২০০৪ সাল থেকে কোপার্নিকাসের কবর খোঁজার কাজ শুরু হয়। স্থানীয় পাদ্রীদের সঙ্গে কথা বলে একটি কবর থেকে যেসব হাড়গোড় উদ্ধার করা হয়, সেগুলোর সঙ্গে তাঁর একটি বইয়ে পাওয়া চুলের ডিএনএ মিলে যায়। এরপর কোপার্নিকাসের দেহাবশেষ পোল্যান্ডের ওলস্টিন শহরের কাছে রাখা হয়। গত শুক্রবার কোপার্নিকাসের দেহাবশেষ রাখার কফিনটি তাঁর স্মৃতিবিজড়িত শহরগুলোতে ঘোরানো হয়। গত ২১ মে কফিনটি পুনরায় সমাধিস্থ করার আগে পোল্যান্ডের ক্যাথলিক চার্চের প্রধান কোপার্নিকাসের প্রতি সম্মান জানান। 'কোপার্নিকাসের পরিশ্রম, কাজ ও বৈজ্ঞানিক মেধার কারণে স্থানীয় ক্যাথলিক চার্চ সম্মানিত বোধ করছে' বলেন ফমবর্ক এলাকার আর্চবিশপ ওসিয়েচ জিয়েমবা।

হাইড্রোজেন তৈরীর সহজ উপায়

কম দামের ধাতব উপাদান ব্যবহার করে পানি থেকেই হাইড্রোজেন গ্যাস বানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। আর এভাবে সস্তায় তৈরী করা গেলে ভবিষ্যতে নবায়নযোগ্য শক্তির জগতে হাইড্রোজেনই প্রধান ভূমিকা রাখবে বলে জানা গেছে। আমেরিকার এনার্জি ডিপার্টমেন্টের অন্যতম গবেষণাগার ন্যাশনাল লরেন্স বার্কলেতেই বিজ্ঞানীরা এই গ্যাসটি তৈরী করতে পেরেছেন। পানি থেকে হাইড্রোজেন তৈরীতে সহায়ক কম দামের এই ধাতব উপাদানটির নাম মলিবডেনাম-অক্সোমেটাল কমপ্লেক্স। প্লাটিনামের তুলনায় এর দাম ৭০ ভাগের এক ভাগ। আর এজন্যই পানির অনুতে ভাঙ্গন ধরাতে এখন এই উপাদানটি সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হচ্ছে। উপাদানটি সহ আবিষ্কারক হিমামালা করুনাদাস জানান, এ ধরনের উপাদানের সঙ্গে কোনো জৈব উপাদান ব্যবহারের দরকার হয় না। নোংরা এবং সাগরের লোনা পানিতেও কাজ করতে পারে উপাদানটি। সাগরের পানি হাইড্রোজেনের বড় ধরনের আধার। একই সঙ্গে লবণাক্ত হওয়ার কারণে বিদ্যুতের সহায়তায় সাগরের পানির উপাদানগুলো আলাদা করাও সহজ। কোনো ধরনের ক্ষতিকর উপজাতক তৈরী না হওয়ার কারণেই নিরাপদ শক্তির অন্যতম উৎস মনে করা হচ্ছে হাইড্রোজেনকে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

প্রশিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ

রাজশাহী ১০-১১ জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে অনুষ্ঠিতব্য দেশব্যাপী যেলা ভিত্তিক কর্মী সমাবেশ ও সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের প্রাক প্রস্তুতি হিসাবে দারুল ইমারত আহলেহাদীছ নওদাপাড়ায় গত ১০-১১ জুন প্রশিক্ষকগণের উদ্দেশ্যে দু'দিন ব্যাপী এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিন সকাল ৯-টায় অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং দ্বিতীয় দিন জুম'আ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মনোনীত প্রশিক্ষকগণ উক্ত প্রশিক্ষণে যোগদান করেন। দু'দিনব্যাপী উক্ত প্রশিক্ষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** এককভাবে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ ও কর্মী সমাবেশ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে যোগ্য কর্মী তৈরী করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী যেলা ভিত্তিক কর্মী সমাবেশ ও সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গত ১৭ জুন থেকে শুরু হয়েছে। যা আগামী ৬ আগষ্ট পর্যন্ত চলবে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ ২ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিন বৃহস্পতিবার বাদ আছর থেকে রাত ১০-টা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দিন শুক্রবার বাদ ফজর হ'তে জুম'আ পর্যন্ত একটানা অনুষ্ঠান চলে। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সহ কেন্দ্র কর্তৃক মনোনীত প্রশিক্ষকগণ কেন্দ্রীয় আলোচ্য সূচী ও সিলেবাস অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। যেলাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট বিধৃত হ'ল-

১. জয়পুরহাট ১৭-১৮ জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার : কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে যেলার ক্ষেতলাল থানাধীন পলিকাদোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ২ দিনব্যাপী কর্মী সমাবেশ ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীল ও অগ্রসর কর্মীগণ উক্ত প্রশিক্ষণে যোগদান করেন।

২. জামালপুর ১৭-১৮ জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার : যেলার ঢেঙ্গারগড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিনব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অদ্য ১৭ জুন বৃহস্পতিবার বাদ আছর শুরু হয়ে পরদিন ১৮ জুন শুক্রবার জুম'আ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা নূরুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা ক্বামারুযযামান ও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব বযলুর রহমান প্রমুখ। দু'দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক সেকেন্দার আলী সহ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

৩. রাজবাড়ী ১৭-১৮ জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার : যেলার মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী কর্মী সমাবেশ ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর রাজশাহী বিভাগীয় সম্পাদক ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

৪. চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১৭-১৮ জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার : যেলার বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী কর্মী সমাবেশ ও সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। ১ম দিন বাদ আছর হ'তে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

৫. বাগেরহাট ১৭-১৮ জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার : যেলার কালদিয়া ইসলামিক কমপ্লেক্স এ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যৌথ উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী কর্মী সমাবেশ ও প্রশিক্ষণ গত ১৭-১৮ জুন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন বাদ আছর হ'তে শুরু হয়ে পরদিন ১৮ জুন শুক্রবার জুম'আ পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি

সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদির ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার প্রমুখ। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলগণ সহ যেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

তাবলীগী ইজতেমা

নাটোর ৯ জুন বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর যেলার উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন বর্ণী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আবুবকর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আযীযুর রহমান প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা ১৪ জুন সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার আলমডাঙ্গা থানাধীন পাইকপাড়া হাইস্কুল ময়দানে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আব্দুল কুদ্দূস-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক সুধী যোগদান করেন। নেতৃবৃন্দ সমবেত মুছল্লীদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেদের সার্বিক জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানান এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হয়ে দাওয়াতী ময়দানে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

আড়াইহাযার, নারায়ণগঞ্জ ১৭-১৮ জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার : যেলার আড়াইহাজার থানাধীন পাঁচরুখী পশ্চিম পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ২ দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক তাবলীগ সম্পাদক ও পাঁচরুখী দারুল হাদীছ সালাফিয়ার উপাধ্যক্ষ মাওলানা শামসুল হক্ব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ইহুদী-খ্রীষ্টান সভ্যতা ও সংস্কৃতির আধুনিকায়নে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শ আজ ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, হক সর্বযুগেই সকল আগ্রাসনের উপরে বিজয়ী হয়েছে। হকের প্রচার মানুষকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল কিছুর উর্ধ্বে উঠে এক মহাসত্যের পথ প্রদর্শন করে। এই হকের দাওয়াতই আহলেহাদীছ আন্দোলনের একমাত্র শক্তি। সে শক্তিতে উদ্ভাসিত হয়েই সারা বিশ্বে আহলেহাদীছ আন্দোলন তার দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী, তাবলীগ সম্পাদক রবীউল ইসলাম, সহ-অর্থ সম্পাদক আলহাজ্জ মুহাম্মাদ হাসান, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ মুহসিন আকন্দ, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ, নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা দেলোওয়ার হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর মোবাল্লিগ মাওলানা শফীকুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার ও 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ফযলুল হক।

নরসিংদী ১৭-১৮ জুন : যেলার নজরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গত ১৭-১৮ জুন দু'দিনব্যাপী এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন বাদ আছর হ'তে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে দ্বিতীয় দিন জুম'আ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও ঢাকা বিভাগীয় সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা জালালুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহফূযুর রহমান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম, দফতর সম্পাদক হাফেয ওয়াহীদুযযামান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুস সাত্তার প্রমুখ।

পলাশপোল, সাতক্ষীরা ১৯ জুন শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব পলাশপোল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সদর এলাকার উদ্যোগে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সদর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর মজলিসে শূরার সদস্য ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ। তাবলীগী ইজতেমায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আব্দুল খালেককে সভাপতি ও মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল খালেককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট সাতক্ষীরা সদর এলাকা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। তাবলীগী ইজতেমায় যেলা ও এলাকা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চোরকোল, ঝিনাইদহ ২৩ জুন বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলার যৌথ উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন চোরকোল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যুবসংঘ

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ১১ জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর খানপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-উত্তর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ ও এলাকা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ।

কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা

কদমতলা, সাতক্ষীরা ১৯ জুন শনিবার : অদ্য বেলা সাড়ে ৩-টায় সাতক্ষীরা শহরের কদমতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে ২০১০ সালে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্রদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি অধ্যাপক শাহীদুয্যামান ফারূক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য ড. এস.এস.এম. আযীযুল্লাহ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অনুষ্ঠানে যেলা 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর রহমান।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'
কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই সমূহ

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
প্রণীত তিনটি বই-
১. ছবি ও মূর্তি
২. তিনটি মতবাদ
৩. তালাক ও তাহলীল

ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ
মূল: ড. নাছের আল-ওমর
অনুবাদ: মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

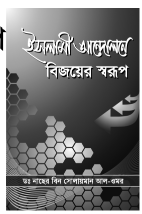

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩৬১)ঃ আমাদের সৈয়দপুর সেনানিবাসে গ্যারিসন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সহ মোট ৪টি জুম'আ মসজিদ আছে। এক্ষণে মুছল্লী বৃদ্ধির জন্য বাকী তিনটি ওয়াক্তিয়া রেখে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে কেবলমাত্র একটি জুম'আ করতে চাই। শরী'আতে এটি জায়েয হবে কি-না।

-শুকুর মাহমূদ
সৈয়দপুর সেনানিবাস, নীলফামারী।

উত্তর ঃ এতে শরী'আতে কোন বাধা নেই; বরং উৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা জুম'আ মসজিদের উদ্দেশ্যই হ'ল জামা'আত বড় হওয়া। জামা'আত যত বড় হবে, মুছল্লীর নেকী তত বেশী হবে। এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য যোরদার হয় এবং পরস্পরে পরিচিতি ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। আর এটাই হ'ল আল্লাহ্র কাম্য। তিনি বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! যখন জুম'আর আযান হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণের দিকে দৌড়ে চলো এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ' *(জুম'আহ ৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জামা'আতে মুছল্লী যত বেশী হবে, আল্লাহ্র নিকটে তা তত বেশী প্রিয়তর হবে' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০৬৬; 'জামা'আত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৯৯৯, ৩/৬৪ পৃঃ)*।

সম্ভবতঃ একারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে মদীনাতে মসজিদে নববীই একমাত্র জুম'আ মসজিদ ছিল। যদিও তখন মুছল্লীর সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। একবার দূরে অবস্থানকারী বনু সালামাহ গোত্র মসজিদে নববীর কাছাকাছি এসে বাড়ী করার আকাংখা ব্যক্ত করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের বলেন, 'হে বনু সালামাহ! তোমরা তোমাদের বাড়ীতেই থাক। কেননা এতে (দূরত্বের কারণে) মসজিদে আসতে তোমাদের পদক্ষেপ বৃদ্ধি পাবে এবং তোমাদের পদচিহ্ন সমূহ (তোমাদের আমলনামায়) লিখিত হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭০০; 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৬৪৮)*। তিনি বলেন, 'ঐ মুছল্লী সবচেয়ে বেশী ছওয়াবের অধিকারী হবে, যে সবচেয়ে দূর থেকে মসজিদে আসে এবং ঐ মুছল্লী অধিক পুরস্কৃত হবে, যে আগে মসজিদে আসে এবং অপেক্ষা করে। অতঃপর ইমামের সাথে ছালাত আদায় করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৯; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৬৪৭)*। এমনকি দূরের বাসিন্দা অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমকেও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মসজিদে জামা'আতে না আসার ব্যাপারে অনুমতি দেননি *(মুসলিম, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১০৫৪, ১০৭৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এক ইমামের অধীনে দুইজনের জামা'আত আল্লাহ্র নিকট অধিক নেকী বর্ধক বিচ্ছিন্ন চারজন মুছল্লীর চাইতে। অনুরূপভাবে চারজনের জামা'আত আটজন বিচ্ছিন্ন মুছল্লীর চাইতে এবং আটজনের জামা'আত একশ' জন বিচ্ছিন্ন মুছল্লীর চাইতে বেশী নেকী বর্ধক' *(ত্বাবারাণী, বাযযার, ছহীহ তারগীব হা/৪১২)*। ছাহেবে মির'আত বলেন, এ হাদীছে প্রতিবাদ রয়েছে ঐসব লোকের, যারা বলেন যে, সকল জামা'আতের নেকী সমান। অথচ ২৭ গুণ নেকী বেশী হওয়ার হাদীছ তার চাইতে বেশী নেকী হওয়ার হাদীছগুলিকে রদ করে না *(মির'আত হা/১০৭৩-এর ব্যাখ্যা, ৩/৫১০ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২/৩৬২)ঃ কালেমা ত্বাইয়েবা কোনটি? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শফীউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর ঃ কালেমা ত্বাইয়েবা হচ্ছে لا إلــه إلا الله 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থ: 'নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত'। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, الكلمة الطيبة لا إله إلا الله 'কালেমায়ে ত্বাইয়েবাহ' হ'ল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' *(তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে ইবনে কাছীর, ইবরাহীম ২৪নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৩/৩৬৩)ঃ মৃতব্যক্তির সম্পদের কত অংশ স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যারা পাবে?

-হাসনা হেনা
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর ঃ মৃতের কোন সন্তান না থাকলে স্ত্রী পাবেন এক-চতুর্থাংশ। আর সন্তান থাকলে আটভাগের একভাগ পাবেন। অবশিষ্ট সম্পদে একজন পুত্র দু'জন কন্যার সমান অংশ পাবে। আর যদি দু'য়ের অধিক শুধু কন্যা সন্তান থাকে তাহ'লে তারা দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। যদি একজন কন্যা সন্তান থাকে তাহ'লে সে পাবে অর্ধেক সম্পত্তি *(নিসা ১১-১২)*।

প্রশ্ন (৪/৩৬৪)ঃ ইমামের পিছনে ছালাতরত অবস্থায় শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও দরূদ পড়ার পর বায়ু নির্গত হ'লে মুক্তাদী কি পুনরায় সম্পূর্ণ ছালাত আদায় করবে? নাকি শুধু শেষ রাক'আত আদায় করবে?

-মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম
কয়েদদাঁড়া, রাজশাহী।

উত্তর ঃ মুক্তাদী পুনরায় সম্পূর্ণ ছালাত আদায় করবে। কারণ সালাম ফিরানোর মাধ্যমে ছালাত সম্পূর্ণ হয় *(আবুদাঊদ হা/৬১; তিরমিযী হা/৩; ইবনু মাজাহ হা/২৭৫)*। উল্লেখ্য, শেষ বৈঠকে বসে ওযূ

নষ্ট হ'লে ছালাত হয়ে যাবে মর্মে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/৪০৮, বিস্তারিত দ্রঃ মির'আত ৩/৩৮৩-৮৬; আবুদাউদ হা/৯৭০)*।

প্রশ্ন (৫/৩৬৫)ঃ আল্লাহ্‌র আকার আছে কি? আল্লাহ্‌র আকার থাকলে তা তাঁর 'অসীম' গুণ সসীম হয় না কি?

-মুহাম্মাদ মাহমূদুল হাসান
কৈটোলা, বেড়া, পাবনা।

উত্তর ঃ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও ছহীহ হাদীছ সমূহে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার আকার আছে। যেমন আল্লাহ্‌র চেহারা *(আর-রহমান ২৭)*, তাঁর দুই হাত *(ছোয়াদ ৭৫; মায়েদাহ ৬৪)*, তাঁর চোখ *(তূর ৪৮)* আছে বলে কুরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে। অনুরূপভাবে হাদীছে এসেছে, আল্লাহ যখন জাহান্নামকে বলবেন, তুমি কি পূর্ণ হয়েছ? তখন সে বলবে, আরো বেশি আছে কি? তখন মহান আল্লাহ জাহান্নামে তাঁর পা রাখবেন। জাহান্নাম তখন বলবে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে *(বুখারী হা/৪৮৪৮; মুসলিম 'জান্নাত' অধ্যায় হা/৩৫, ৩৭, ৩৮; মিশকাত হা/৫৬৯৪-৯৫)*। তাছাড়া মুমিনগণ জান্নাতে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভে সর্বাধিক খুশি হবেন *(মুসলিম হা/৪৬৬-৬৭ 'ঈমান' অধ্যায়)*। কুরআন ও হাদীছে এ ধরনের অনেক প্রমাণ রয়েছে।

আল্লাহ্‌র নিজস্ব আকার আছে। কিন্তু তা কারু সাথে তুলনীয় নয় *(শূরা ১১; নাহল ৭৪)*। আল্লাহ নিরাকার হ'লে মুমিনগণ কিভাবে তাঁকে জান্নাতে দেখতে পাবেন? ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হ'ল, মুমিনগণ জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভে ধন্য হবেন। আল্লাহ্‌র দর্শনকে কেবল বিদ'আতী মু'তাযিলা, মাতুরিদিয়া ও কতিপয় মুর্জিয়া অস্বীকার করে।

আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও ক্ষমতা অসীম। সুতরাং তাঁর আকার থাকা এ গুণের বিরোধী নয়। অতি যুক্তিবাদীরা আল্লাহকে অবশেষে আকার ও গুণহীন শূন্য সত্তায় পরিণত করেছে। যা নাস্তিক্যবাদের শামিল এবং কুরআন ও হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের বিরোধী *(দ্রঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন থিসিস, পৃঃ ৯৮)*।

প্রশ্ন (৬/৩৬৬)ঃ আমরা জানি চুলে কলপ ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু অল্প বয়সে কারো চুল পেকে গেলে এবং চিকিৎসায় কোন ফল না হ'লে কালো খেযাব বা কলপ ব্যবহার করা যাবে কি?

-রফীকুল ইসলাম
শ্যামপুর, রাজশাহী।

উত্তর ঃ কালো খেযাব বা কলপ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাদা চুল কালো করা থেকে বেঁচে থাক' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৪)*। তিনি আরো বলেছেন, 'শেষ যামানায় এমন কিছু লোক হবে যারা কবুতরের বক্ষের ন্যায় কালো রঙের খেযাব দিয়ে চুল কালো করবে। তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫২ 'পোষাক' অধ্যায়, 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। এমন অবস্থায় মেহেদী রংয়ের খেযাব লাগানো উত্তম *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫১)*।

প্রশ্ন (৭/৩৬৭)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি লাঠি হাতে নিয়ে খুৎবা দিতেন?

-রেযওয়ান আহমাদ
মিয়াঁপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাতে লাঠি নিয়ে জুম'আর খুৎবা দিতেন। এটি সুন্নাত। হাকাম বিন হাযন আল-কুলাফী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জুম'আর দিন হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিতে দেখেছি *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান, হা/১০৯৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৬১৬, ৩/৭৮; বায়হাক্বী ৩/২০৬, সনদ ছহীহ; বুলূগুল মারাম হা/৪৬৩)*। অনুরূপ ঈদের মাঠে এবং অন্যান্য স্থানেও বক্তব্যের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাতে লাঠি নিয়েছেন *(আবুদাঊদ হা/১১৪৫, সনদ হাসান; ইরওয়াউল গালীল হা/৬৩১, ৩/৯৯; আহমাদ ৩/৩১৪, সনদ ছহীহ)*।

উল্লেখ্য, মিম্বর তৈরীর পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাতে লাঠি নেননি বলে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) দাবী করেছেন। কিন্তু উক্ত কথার পক্ষে কোন দলীল নেই। শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত দলীল বিহীন বক্তব্য উল্লেখ করে শুধু জুম'আর দিনের বিষয়টি সমর্থন করেছেন। তবে ঈদের খুৎবা সহ অন্যান্য বক্তব্যের সময়ে হাতে লাঠি নেওয়া যাবে বলে উল্লেখ করেছেন *(আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৬৪, ২/৩৮০-৩৮৩ পৃঃ)*।

মূল কথা হ'ল, মিম্বর তৈরীর পরও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিয়েছেন। কারণ মিম্বর তৈরী হয়েছে ৫ম হিজরীতে। আর হাকাম বিন হাযন ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের বছরে ইসলাম কবুল করে মদীনায় আগমন করেন এবং জুম'আর দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিতে দেখেন *(আবুদাঊদ হা/১০৯৬; বুলূগুল মারাম হা/৪৬৩-এর টীকা দ্রঃ)*। দ্বিতীয়তঃ হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেওয়ার হাদীছটি ব্যাপক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব সময় লাঠি নিয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়। ফাতিমা বিনতু ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা সাধারণ আলোচনার সময় মসজিদে মিম্বরে বসে লাঠি দিয়ে মিম্বরে আঘাত করে দু'বার বললেন, 'হাযিহী ত্বায়বাহ' এটি মদীনা শহর... *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮২ 'ফিতান' অধ্যায়)*। তৃতীয়তঃ মিম্বর তৈরীর পর রাসূল (ছাঃ) হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেননি- একথার কোন প্রমাণ নেই। চতুর্থতঃ ছাহাবীদের মধ্যেও মিম্বরে দাঁড়িয়ে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (১-৭৩হিঃ) মক্কায় দিয়েছেন *(তারীখু বাগদাদ ১৪/৩৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৮/৩৬৮)ঃ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি কিভাবে তার ওয়ারিছগণের মধ্যে বণ্টিত হবে? মৃতব্যক্তি কোন অছিয়ত করে গেলে এবং তার ওয়ারিছগণ ইচ্ছাকৃতভাবে সেই অছিয়ত পূরণ না করলে কে দায়ী হবে? এজন্য মৃতব্যক্তির কবরে আযাব হবে কি?

-মাসঊদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর ঃ কুরআন ও হাদীছে নির্ধারিত হিসাব অনুযায়ী ওয়ারিছগণ সম্পত্তি বণ্টন করে নিবেন *(নিসা ১১-১২)*। ওয়ারিছগণ মৃতব্যক্তির শরী'আত সম্মত অছিয়ত বাস্তবায়ন না করলে তারাই এর জন্য গুনাহ্‌গার হবে। এর জন্য মৃতব্যক্তি দায়ী হবে না এবং এজন্য তার কবরে আযাবও হবে না।

প্রশ্নঃ (৯/৩৬৯)ঃ এক ব্যক্তি ঈদগাহের জমি নিজের নামে রেকর্ড করে নেন। উল্লেখ্য যে, জমিটি সরকারী খাসের ছিল এবং ঈদগাহের নামে জমিটি মৌখিকভাবে দান করা ছিল। এখন ঐ ব্যক্তি নিজ সুবিধার জন্য গ্রামবাসীকে জমিটি ফিরিয়ে দিতে চান এবং এতে গ্রামবাসীরা দু'টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত ঐ ঈদগাহে ছালাত আদায় করা বৈধ হবে কি?

-আব্দুল আলিম
শিরতা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তর ঃ নিজ সুবিধার জন্য নয়, ভুল বুঝতে পেরে জমিটি ঈদগাহের নামে ওয়াক্ফ করে দেওয়া উচিত। ওয়াক্ফ করে দিলে অবশ্যই সেখানে ছালাত আদায় করা বৈধ হবে। এজন্য দলাদলি করে দু'স্থানে ছালাত আদায় করা বৈধ হবে না। সরকারী জমিতে ঈদগাহ করা হ'লে মৌখিক নয়; বরং লিখিত অনুমতি নেওয়া উত্তম।

প্রশ্নঃ (১০/৩৭০)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে কারা দেখতে পারে? তাঁকে স্বপ্নে দেখার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি? হাদীছে বর্ণিত শামায়েলে রাসূলের সাথে স্বপ্নে দেখা ব্যক্তির মিল হ'লে রাসূলকে দেখেছেন বলে সাব্যস্ত হবে কি? শোনা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে এবং জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না। এটা কতটুকু সঠিক? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কারা স্বপ্নে দেখতে পারে এব্যাপারে হাদীছে কিছু বলা হয়নি এবং তাঁকে স্বপ্নে দেখার বিশেষ কোন ফযীলতও বলা হয়নি। তবে হাদীছে এভাবে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে প্রকৃতই আমাকে দেখেছে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬০৯)*। তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে, সে সত্যই আমাকে দেখেছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬১০)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে, অচিরেই সে আমাকে (ক্বিয়ামতের দিন) জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পাবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬১১)*। উল্লেখ্য যে, প্রশ্নে বর্ণিত ফযীলতের কথা হাদীছে পাওয়া যায় না। কাজেই তা সঠিক নয়।

প্রশ্ন (১১/৩৭১)ঃ ছালাতের মধ্যে কোথায় হাত বাঁধতে হবে?

-আনীসুর রহমান
ভোমরা, সাতক্ষীরা।

উত্তর ঃ ছালাতের মধ্যে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে বুকের উপরে বাঁধতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯৭-৯৮; আবুদাঊদ হা/৭৫৯)*। এছাড়া ডান হাতকে বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর রাখা মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(আবুদাঊদ হা/৭২৭; নাসাঈ হা/৮৮৯)*। উল্লেখ্য, নাভীর নীচে বা উপরে হাত রাখা মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৫৬, ৭৫৭, ৭৫৮; ইরওয়াউল গালীল হা/৩৫৩)*।

প্রশ্ন (১২/৩৭২)ঃ 'আখেরী চাহারশম্বা' কাকে বলে। শরী'আতে এ দিবসে কোন আনুষ্ঠানিকতা আছে কি?

-আরীফুল ইসলাম
খয়েরসুতী, পাবনা।

উত্তর ঃ 'আখেরী চাহারশম্বা' কথাটি ফার্সী। ইরান, ইরাক, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে আরবী ছফর মাসের শেষ বা চতুর্থ বুধবারকে 'আখেরী চাহারশম্বা' বলা হয়ে থাকে এবং দিবস হিসাবে পালন করা হয়। কথিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে) এদিনে রোগযন্ত্রণা থেকে কিছুটা উপশম পেয়েছিলেন এবং গোসল করেছিলেন *(ইসলামী বিশ্বকোষ ১/১১৩ পৃঃ)*। আরো কথিত আছে যে, সেদিন তিনি কিছুটা হালকাবোধ করেন *(ফীরোযুল লুগাত, পৃঃ ১১)*। ইসলামী শরী'আতে এ দিবসের কোন ভিত্তি নেই। বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, 'আখেরী চাহারশম্বা উদযাপনের কোন নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় ভিত্তি পাওয়া যায় না' *(ঐ, ১/১১৩)*। সুতরাং এ দিবসকে কেন্দ্র করে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা এবং কোন অনুষ্ঠান পালন করা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই। অতএব তা বর্জন করা কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি এমন কোন আমল করে যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০, 'ঈমান' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৭৩)ঃ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেন আদমকে সিজদা করার জন্য। প্রশ্ন হ'ল, আল্লাহ আদমকে কেন সিজদা করার নির্দেশ দিলেন?

-আব্দুল মালেক
বগুড়া।

উত্তর ঃ আদমকে সৃষ্টি করার আগেই আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আদমের প্রতি সিজদা করার কথা বলে দিয়েছিলেন *(হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/১১)*। তাছাড়া কুরআনের বর্ণনা সমূহ থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, আদমকে সিজদা করার জন্য আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যক্তি আদম হিসাবে ছিল না, বরং ভবিষ্যৎ মানব জাতির প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে তাঁর প্রতি সম্মান জানানোর জন্য জিন ও ফিরিশতাদের সিজদা করতে বলা হয়েছিল। এই সিজদা কখনোই আদমের প্রতি ইবাদত পর্যায়ের ছিল না। বরং তা ছিল মানবজাতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও তাদেরকে সকল কাজে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দানের প্রতীকী ও সম্মান সূচক সিজদা মাত্র *(দ্রঃ নবীদের কাহিনী ১/১৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৭৪)ঃ বিতর ছালাতের সঠিক পদ্ধতি কী? উক্ত ছালাত কত রাক'আত পড়া যায়?

-রফীকুল ইসলাম
বগুড়া।

উত্তর ঃ বিতর ছালাত এক, তিন, পাঁচ, সাত ও নয় রাক'আত পর্যন্ত পড়া যায়। তিন রাক'আত বিতর পড়লে এক তাশাহহুদে আদায় করতে হবে। দু'রাক'আত পড়ার পর বসা যাবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৫৪)*। কারণ রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) বিতর ছালাতকে মাগরিবের ছালাতের মত করে আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(দারাকুৎনী হা/১৬৩৪-৩৫ সনদ ছহীহ)*। অনুরূপ পাঁচ রাক'আত পড়লেও মধ্যে না বসে এক তাশাহ্হুদে পড়তে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৫৬)*।

সাত রাক'আত পড়লে ছয় রাক'আতের পর তাশাহ্হুদ পড়ে আবার শেষ রাক'আত পড়ে দ্বিতীয় তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফেরাবে *(আবুদাঊদ হা/১৩৪২)*। নয় রাক'আত পড়লে আট রাক'আত পড়ে তাশাহ্হুদ পড়তে হবে এবং শেষের রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাবে *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১১৯১; ছহীহ নাসাঈ হা/১৭১৯)*।

উল্লেখ্য, তিন রাক'আত বিতরের ক্ষেত্রে দু'রাক'আত পড়ে বসার কোন ছহীহ দলীল নেই। 'রাতের বিতর দিনের বিতর মাগরিবের ছালাতের মত' মর্মে যে হাদীছ দারাকুৎনীতে বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ। উক্ত বর্ণনাতে ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া কূফী ইবনু আবিল হাওয়াজিব নামে দুর্বল রাবী আছেন *(দারাকুৎনী হা/১৬৩৭)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৭৫)ঃ জনৈক আলেম বলেন, প্রস্রাব করার পর ঢিলা-কুলুখ নিয়ে চল্লিশ কদম হাঁটতে হবে, কাশি দিতে হবে। কেননা প্রস্রাব আটকে থাকে। এরূপ না করলে ছালাত শুদ্ধ হবে না। এই দাবীর শারঈ ভিত্তি চানতে চাই?

-জাহিদুল ইসলাম
বগুড়া।

উত্তর ঃ ঢেলা-কুলুখ নিয়ে চল্লিশ কদম হাঁটা ও কাশি দেওয়া মর্মে শরী'আতে কোন বিধান নেই। এগুলো বাড়াবাড়ি মাত্র। রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ পানি এবং ঢেলা এক সঙ্গে ব্যবহার করেননি। কারো সন্দেহ হ'লে ওযূ শেষে লজ্জাস্থান বরাবর কাপড়ে পানি ছিটিয়ে দিবে। *(আবুদাঊদ হা/১৬৭; আহমাদ, দারাকুৎনী, মিশকাত হা/৩৬৬)*।

উল্লেখ্য যে, ঢেলা নেওয়ার পর পানি নেওয়ার যে ফযীলত সমাজে চালু আছে তা জাল বা মিথ্যা প্রচারণা মাত্র *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১০৩১-এর ভাষ্য; দ্রঃ ইরওয়া হা/৪২)*। ঢেলা না নিয়ে শুধু পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার জন্যই আল্লাহ ক্বোবাবাসীদের প্রশংসা করেছেন সূরা তওবাহ ১০৮ আয়াতে *(আবুদাঊদ হা/৪৪; হাকেম হা/৬৭৩)*। কারণ পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করায় তখনকার মানুষ অভ্যস্ত ছিল না।

প্রশ্ন (১৬/৩৭৬)ঃ মাসিক আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০০৯ সংখ্যা ১২নং পৃষ্ঠায় 'নয়টি প্রশ্নের উত্তর' নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, যাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি, তাদের জন্য আখিরাতে আল্লাহ্র বিশেষ ব্যবস্থাপনা থাকবে। আর সেটা এই যে, তাদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তাদের কাছে একজন রাসূল পাঠাবেন। প্রশ্ন হ'ল, ঐ রাসূলের নাম কী?

-জাফরুল ইসলাম
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর ঃ উক্ত হাদীছে ঐ রাসূল বা দূতের নাম উল্লেখ করা হয়নি *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৩৪)*। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন (১৭/২৭৭)ঃ তাফসীর ইবনে কাছীরে উল্লেখ আছে, প্রত্যেক যমীনের পুরুত্ব পাঁচশ' বছর। এক যমীন থেকে অপর যমীন ও দূরত্ব পাঁচশ' বছরের। আবার সপ্তম আসমান থেকে আরশে আযীমের দূরত্ব হচ্ছে ৩৬ হাযার বছরের। এসব তথ্য কি সঠিক?

-নাজমুর রহমান
গোবিন্দা, পাবনা।

উত্তর ঃ বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত হ'লেও এর কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। এরূপ ভাবার্থের একটি হাদীছ তিরমিযীতে এসেছে, কিন্তু সেটাও ছহীহ নয় *(যঈফ তিরমিযী হা/৩২৯৮; সূরা হাদীদ ২ ও ৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। এ ব্যাপারে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (১৮/৩৭৮)ঃ আল্লাহ্র কাছে দো'আ করার সময় আল্লাহ সুবহা-নাহু ওয়া তা'আলা, আল্লাহ পাক, আল্লাহ তা'আলা এসব শব্দ ব্যবহার করা যাবে কি?

-জাদীদা
জাগীর হোসেন একাডেমী, পাবনা।

উত্তর ঃ উক্ত শব্দগুলো আল্লাহ্র নামের সাথে যোগ করে বলা যাবে। কারণ এগুলো হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন 'আল্লাহ্ তা'আলা' *(বুখারী হা/৩৯৪; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১০১)*। 'আল্লাহ সুবহানাহু' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৫৮)*। 'আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/২১৬৩)*। আর আল্লাহ্ পাক শব্দটি হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহুর সমার্থক। অতএব এসব শব্দ আল্লাহ্র ব্যাপারে ব্যবহার করা যাবে।

প্রশ্ন (১৯/৩৭৯)ঃ বাহাউল্লাহ অর্থ কী? বাহাঈ মতবাদের প্রবর্তক কে? এটা কখন চালু হয়েছে? এ মতবাদের অনুসারীরা কি মুসলিম? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু তাহের
পশ্চিম গাটিয়া ডাঙ্গা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর ঃ বাহাইয়াহ্ নামে একটি ঈমান বিধ্বংসী ভ্রান্ত বাতেনী মতবাদ রয়েছে। এর প্রবর্তক হচ্ছে মিরযা হুসাইন আলী মাযেনদারানী (১২৩৩-১৩০৯ হিজরী)। সে ইরানে "নূর" নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করে। ৭৫ বছর বয়সে সে পাগল হয়ে মারা যায়। সে নিজেকে বাহাউল্লাহ্ হিসাবে দাবী করে। যার অর্থ আল্লাহ্র নূর (অর্থাৎ তার মধ্যে আল্লাহ্র নূরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে)। পূর্বে সে শী'আ রাফেযী সম্প্রদায়ের অনুসারী ছিল।

এরা মুসলমান নয়। এটি একটি স্বতন্ত্র বানোয়াট ধর্ম। এদের অনুসারীদের আক্বীদা-বিশ্বাসই তার প্রমাণ বহন করে। যেমন- (১) তারা মন মত কুরআনের ব্যাখ্যা করে থাকে (২) মাযেন্দারানীকে প্রভু, মা'বূদ ও ওকা শহরের বাহযার বাড়ীকে কিবলা মনে করে (৩) আল্লাহ্র সব নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করে। (৪) মাহরামদের সাথে বিয়ে করাকে বৈধ মনে করে। (৫) তারা বলে সব ধর্মই সঠিক এবং তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। (৬) তারা এক কালের চীন, ইন্ডিয়া ও পারসীয়

শাসক বূযা, কুনফুসিয়াস ও যারাদাশ্‌তকে নবী বলে বিশ্বাস করে। (৭) তারা নবীগণের মু'জিযা, ফেরেশতা ও জ্বিনদের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। (৮) জান্নাত ও জাহান্নামকে অস্বীকার করে। (৯) তারা মনে করে বাহাউল্লাহ্‌র দ্বীন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শরী'আতকে রহিত করে দিয়েছে। (১০) মুহাম্মাদ-এর শেষনবী হওয়াকে তারা অস্বীকার করে এবং দাবী করে যে, অহী অব্যাহত থাকবে। (১১) তারা কা'বা গৃহের উদ্দেশ্যে হজ্জকে বাতিল করে বাহাউল্লাহকে যেখানে দাফন করা হয়েছে অর্থাৎ ''আল-বাহজাহ''-তে হজ্জ করাকে তাদের শরী'আত মনে করে। (১২) একমাত্র মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করা ছাড়া তারা জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করাকে জায়েয মনে করে না। (১৩) তাদের নিকট ছালাত তিন ওয়াক্ত; সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যার ছালাত। প্রত্যেকবারে তিন রাক'আত ছালাত আদায় করে থাকে। মুখ ও দু'হাত ধৌত করাই হচ্ছে তাদের ওযূ (১৪) তারা এ বিশ্বাস করে যে, জান্নাত হচ্ছে বাহাউল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা। আর জাহান্নাম হচ্ছে তার অনুসরণ না করা। (১৫) পুনরুত্থান ও হিসাব দিবসকে তারা অস্বীকার করে।

অতএব এরা ইসলামের নামে একটি অমুসলিম, কাফের সম্প্রদায়, যারা অন্যান্য অনৈসলামী ধর্মের চেয়েও নিকৃষ্ট। ইহুদীদের সাথে এদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে' *(বিস্তারিত দ্রঃ শায়খ রাশেদ ইবনু আব্দিল মু'তী, আল-বাহাইয়্যাহ্‌ আযযলালা : নাশআতুহা ও ইনহিরাফাতুহা; ডঃ তৃল'আত যাহরান ইস্কান্দারী, 'আল-বাহাইয়্যাহ্‌')*।

প্রশ্ন (২০/৩৮০)ঃ তাবলীগ জামা'আতের সাথে ৪০ দিনের চিল্লায় গিয়ে জানতে পারলাম যে, দাওয়াতের কাজে বের হয়ে নিজের প্রয়োজনে ১ টাকা খরচ করলে ৭ লক্ষ টাকা ছাদাক্বা করার সমান ছওয়াব পাওয়া যায়। একবার সুবহানাল্লাহ বললে ৪৯ কোটি ছওয়াব আমলনামায় লেখা হয়। এসব কথা কি সঠিক? দাওয়াতী কাজের সঠিক পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এ.টি.এম. শামসুজ্জোহা
উপযেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর ঃ দু'টি যঈফ হাদীছের ভুল ব্যাখ্যা করে উক্ত ফযীলত সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন 'ছালাত, ছিয়াম ও যিকিরকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার উপরে ৭০০ গুণ নেকী বৃদ্ধি করা হয় *(আবুদাঊদ, 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৪)*। অন্যটি হ'ল, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় টাকা প্রেরণ করল এবং নিজ বাড়ীতে অবস্থান করল সে প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে ৭০০ দিরহামের নেকী পেল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করল এবং খরচ করল, সে ব্যক্তি প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে ৭ লক্ষ নেকী পেল *(ইবনু মাজাহ, 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৪, মিশকাত হা/৩৮৫৭ 'জিহাদ' অধ্যায়)*। উক্ত দুই হাদীছের আলোকে প্রত্যেক সৎ আমলকে গুণ করে (৭০০×৭,০০,০০০) তারা ৪৯ কোটি বানিয়ে থাকে।

প্রথমতঃ উক্ত দু'টি হাদীছই যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ হা/২৪৯৮; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৭৬১)*। দ্বিতীয়তঃ দুই হাদীছে দুই রকম ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু একত্রিত করে গুণ করার এখতিয়ার কে দিল? প্রতি নেকীর বিনিময়ে উনপঞ্চাশ কোটি নেকী পেলে তো রাসূল (ছাঃ)ই বলে যেতেন। এ ধরনের উদ্ভট ফযীলতের ধোঁকা থেকে বেঁচে থেকে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত ফযীলতের আমল সমূহ করা কর্তব্য।

তাবলীগ জামা'আতের লোকেরা এরূপ বহু ফযীলতের কথা বলে থাকে। যার সিংহভাগই মিথ্যা ও বানোয়াট। প্রচলিত চিল্লা পদ্ধতির দাওয়াত সুন্নাতী তরীকার দাওয়াত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), তাঁর ছাহাবীগণ এবং তাবে'ঈগণের যুগ থেকে শুরু করে বিগত একশত বছর পূর্বেও এ পদ্ধতি সম্পর্কে মুসলমানগণ জানতেন না। এটি একটি বিদ'আতী পদ্ধতি। এছাড়া এ জামা'আতের সাথে যারা বের হন, তারা বহু মিথ্যা কারামতের বানোয়াট কেচ্ছা-কাহিনী এবং জাল-যঈফ হাদীছ বর্ণনা করে থাকেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

প্রশ্ন (২১/৩৮১)ঃ মসজিদের ইমাম সচ্ছল হ'লে বেতন নিয়ে ইমামতি করতে পারবেন কি?

-ইনামুল হুদা
সোনাবাড়ীয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর ঃ সচ্ছল হিসাবে বেতন ছাড়াই ইমামতি করা উত্তম। এটি অত্যন্ত সম্মানিত দায়িত্ব। তাই বেতন নিয়ে দর কষাকষি করা মর্যাদাকর নয়। মুছল্লীদের উচিত ইমামের জন্য সম্মানজনক ভাতার ব্যবস্থা করা। কারণ ভাতা নির্ধারণ না হ'লে ইমামের মাঝে অলসতা আসতে পারে। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, 'যে লোককে আমরা কোন কাজে নিয়োগ করি এবং তাকে সে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করি। যদি সে এরপর তার শ্রমের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে তবে তা খিয়ানত হবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৪৮)*।

প্রশ্ন (২২/৩৮২)ঃ যারা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে না তারা মসজিদ কমিটির সদস্য হ'তে পারে কী?

-ইনামুল হক
সোনাবাড়ীয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর ঃ তারা মসজিদ কমিটির সদস্য হ'তে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ্‌র মসজিদে আবাদকারী (তত্ত্বাবধায়ক ও খাদেম) তো সে লোকেরাই হ'তে পারেন যারা আল্লাহ এবং পরকালকে বিশ্বাস করে, ছালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে, আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না' *(তওবাহ ১৮)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ মসজিদ আবাদকারীদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, যা মসজিদ কমিটির সদস্যদের থাকা যরূরী।

প্রশ্ন (২৩/৩৮৩)ঃ সুন্নাত আরম্ভ করেছি এমন সময় ইমাম ছাহেব ফরয ছালাত আরম্ভ করেন। এ সময় তাড়াতাড়ি করে সুন্নাত পড়া যাবে কি?

-আব্দুল করীম
বনপাড়া, দরবস্ত, সিলেট।

উত্তর ঃ উক্ত অবস্থায় সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে যোগ দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফরয ছালাতের এক্বামত হ'লে সেই ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাত চলবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৮৪)ঃ সূরা আ'রাফের ২০৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, কুরআন তেলাওয়াতের সময় চুপ থাকতে হবে। অত্র আয়াতটি প্রমাণ করে যে, সূরা ফাতিহা ইমামের পিছনে পড়তে হবে না। বিষয়টি জানতে চাই।

-শহীদুর রহমান
কলনী, মেহেরপুর।

উত্তর ঃ ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া উক্ত আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। উক্ত আয়াতে কুরআন পড়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সূরা ফাতেহাকে নয়। আল্লাহ তা'আলা নিজেই সূরা ফাতেহা ও কুরআনকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন *(হিজর ৮৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকলের জন্য সূরা ফাতেহা পড়াকে বিধিবদ্ধ করেছেন *(বুখারী হা/৭৫৬)*। এজন্য ইমাম বুখারী (রহঃ) অধ্যায় রচনা করেছেন যে, 'ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য জেহরী, সেররী এবং সফরে ও মুকীম অবস্থায় সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব *(হা/৭৫৫)*। তাছাড়া এ বিষয়ে রাবী আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করা হ'লে, তিনি বলেন, তুমি চুপে চুপে পড়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩)*।

ওবাদা ইবনে ছমিত (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না, তার ছালাত হয় না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮২২)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৮৫)ঃ পুরুষের বড় চুল রাখা শরী'আত সম্মত কি?

-খায়রুল ইসলাম
মেহেরপাড়া, পাবনা।

উত্তর ঃ পুরুষ বড় চুল রাখতে পারে। তবে চুলের পরিমাপ আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাথায় তিন ধরনের চুল থাকত। জুম্মা, লিম্মা ও ওয়াফরা। সবচেয়ে বড় হ'ল জুম্মা যা কাঁধের উপর ঝুলে পড়ত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৩৫)*। তার চেয়ে ছোট লিম্মা যা প্রায় কাঁধের কাছাকাছি ঝুলে পড়ত *(নাসাঈ হা/৫০৬২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চুল সাধারণত জুম্মার চেয়ে ছোট এবং ওয়াফরার চেয়ে বড় থাকত *(ইবনু মাজাহ হা/৩৬৩৫)*। আরবী শব্দ وَفْــرَةٌ جُمَّةٌ –لِمَّه আর অক্ষর অনুযায়ী প্রথমে জীম সবচেয়ে বড় জুম্মা-তার পর লাম- তার চেয়ে ছোট লিম্মা لِمَّةٌ তার পর (و) সবচেয়ে ছোট (وَفْرَه)।

প্রশ্ন (২৬/৩৮৬)ঃ জিনিস-পত্র বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লাভের কোন সীমা আছে কি?

-ফয়েয
ধামতী মিরবাড়ী, কুমিল্লা।

উত্তর ঃ লাভের কোন নির্ধারিত সীমা নেই। চলতি বাজার দর হচ্ছে সীমা, যা চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। কোন পণ্যের দাম বাজার মূল্যের চেয়ে বেশী নিলে যুলুম করা হবে, যা হারাম। অনেক সময় ক্রয়মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য দ্বিগুণও হ'তে পারে। একদা ওরওয়া ইবনু আবিল জা'দ আল-বারেক্বী নামক জনৈক ছাহাবীকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি দীনার প্রদান করেন একটি বকরী ক্রয়ের জন্য। ছাহাবী তা দিয়ে দু'টি বকরী কেনেন এবং একটি বিক্রয় করেন এক দীনারে। অতঃপর রাসূলকে একটি বকরী ও একটি দীনার ফেরৎ দেন। এতে খুশী হয়ে রাসূল (ছাঃ) তার ব্যবসায়ে বরকতের দো'আ করেন। তাতে ফল হয়েছিল এই যে, ঐ ব্যক্তি মাটি কিনলেও তাতে লাভ হ'ত *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৩২)*। কিন্তু এটি হ'ল সাধারণ বাজার দরের বিষয়। কিন্তু যখন ব্যবসায়ী ব্যক্তি বা সমিতি অন্যায়ভাবে মুনাফা লোটার জন্য একযোগে মূল্যবৃদ্ধি করবে, অন্যায় উদ্দেশ্যে মওজূদদারী করবে, প্রতারণামূলক ভাবে জিনিষপত্রের দাম বাড়াবে, তখন সেটা যুলুম হবে, যা হারাম। আল্লাহ বলেন, তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না' *(বাক্বারাহ ১৭৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৮৭)ঃ জনৈক মাওলানা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা জাহান্নামী। প্রশ্ন হ'ল, কেন তারা জাহান্নামী? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুফারিশ করে তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেন কী?

-শাহাদত
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা অমুসলিম অবস্থায় মারা গেছেন। তাই তিনি তাদের ব্যাপারে কোন সুফারিশ করতে পারবেন না' *(মুসলিম হা/২৩০৪ 'জানাযা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩৬)*। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে তার মায়ের কবর যেয়ারতের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি দেননি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৩)*। আল্লাহ বলেন, 'নবী এবং ঈমানদার গণের পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা চাইবে,তারা তাদের আত্মীয় হ'লেও' *(তওবাহ ১১৩)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৮৮)ঃ শুনেছি স্বামী-স্ত্রী দু'জনের একজন ছালাত আদায় না করলে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ফেরাউন ও তার স্ত্রী আসিয়ার সম্পর্ক কিভাবে ছিল?

-মামূন
পাতাড়ী, নওগাঁ।

উত্তর ঃ এতে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় না। তবে ছালাত তরককারী ব্যক্তি মহাপাপী। ফেরাউনের বিধি-বিধান আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কুরআনে আল্লাহ আসিয়াকে ফেরাউনের স্ত্রী হিসাবে উল্লেখ করেছেন *(তাহরীম ১৩)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৮৯)ঃ নির্দিষ্ট একটি দিনকে দো'আ দিবস বা দলীয়ভাবে ছিয়াম রাখার জন্য নির্দিষ্ট করা কি শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিষয়টি জানতে চাই।

-তারিক হাসান
কুঠিপাড়া, পাবনা।

www.at-tahreek.com

উত্তর: নির্দিষ্ট একটি দিনকে দলবদ্ধভাবে ছিয়াম পালনের জন্য নির্ধারণ করা মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট নতুন একটি বিদ'আত। এরূপ কোন উদাহরণ রাসূল (ছাঃ) ও সালাফে ছালেহীনের যুগে খুঁজে পাওয়া যায় না। রাসূল (ছাঃ) দ্বীনের মধ্যে যে কোন নতুন প্রথা উদ্ভাবনের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*। সালাফে ছালেহীন কখনই নির্দিষ্ট একটি দিনকে দো'আ দিবস বা ছিয়ামের জন্য এবং নির্দিষ্ট একটি রাতকে নফল ছালাতের জন্য নির্ধারণ করেন নি কেবল শরী'আত অনুমোদিত নফল ছিয়ামসমূহ ব্যতীত। যেমন প্রতি মাসে আইয়ামে বীযের তিনটি ছিয়াম, সোম ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম, আরাফার ছিয়াম, মুহাররমের নবম ও দশম তারিখের ছিয়াম ইত্যাদি যা ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল (ছাঃ) জুম'আর দিনকে ছিয়ামের জন্য বা জুম'আর রাতকে ক্বিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করতে নিষেধ করে বলেন, 'তোমরা রাত্রিগুলোর মধ্যে কেবল জুম'আর রাতকে ক্বিয়ামুল লাইল এবং জুম'আর দিনটিকে ছিয়াম পালনের দিবস হিসাবে নির্দিষ্ট করো না। তবে নফল ছিয়াম যা তোমরা নিয়মিত করে থাক তা ব্যতিত (যদিও তা জুম'আর দিনে পড়ে যায়) *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫২)*। এরপরেও যখন এগুলি রাজনৈতিক ফায়েদা হাছিলের উদ্দেশ্যে করা হয়, তখন তা আরও জঘন্য বিদ'আতে পরিণত হয়। হিজরী ৭ম শতকের শুরুতে ক্রুসেড যুদ্ধের সময় ইরাকের এরবল প্রদেশের গভর্ণরের উদ্যোগে এভাবেই রাজনৈতিক ফায়েদা হাছিলের উদ্দেশ্যে কথিত 'ঈদে মীলাদুন্নবী'র উদ্ভব ঘটে। অতএব ঈমানদারগণের জন্য এসব থেকে দূরে থাকা কর্তব্য।

প্রশ্ন (৩০/৩৯০)ঃ লাশ কবরে নিয়ে যাওয়ার সময় চারজন ব্যক্তি খাটিয়া কাঁধে নেয়। রাস্তায় তারা কাঁধ পরিবর্তন করে এবং মুখে বলতে থাকে 'আল্লাহ রাব্বী' 'মুহাম্মদ নাবী'। এরূপ বলা যায় কি?

-আহমাদ
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর ঃ লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় বিনা ওযরে কাঁধ পরিবর্তন করা যাবে না এবং করার সময় 'আল্লাহ রাব্বী' ও 'মুহাম্মাদ নবী' বলার কোন শারঈ বিধান নেই। বরং এটা কুসংস্কার মাত্র। ছাহাবী ও তাবেঈগণ এরূপ করতেন না।

প্রশ্ন (৩১/৩৯১)ঃ কোন সৎ উদ্দেশ্যে পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া যাবে কি?

-মানযুরা খাতন
বাউসা হেদাতীপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর ঃ সৎ উদ্দেশ্যের বিষয়টি পিতা-মাতাকে সাধ্যমত বুঝাতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, পিতা-মাতার সন্তুষ্টি হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, আর পিতা-মাতার অসন্তুষ্টি হচ্ছে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯২৭)*। তবে পিতা-মাতা যদি শরী'আত বিরোধী কোন আদেশ দেন, সেটা মানা যাবে না। কিন্তু তাদের সঙ্গে সর্বদা সদ্ব্যবহার বজায় রাখতে হবে *(লোকমান ১৫)*। পিতা-মাতা ও সন্তান উভয়কে মনে রাখতে হবে যে, 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই' *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৯২)ঃ জনৈক ব্যক্তি অন্য মেয়েদের না জানিয়ে ছোট মেয়ের নামে কিছু জমি লিখে দেন। একাজ বৈধ হয়েছে কি?

-আযাদ
মেহেরপুর।

উত্তর ঃ এটা অবৈধ হয়েছে। এ অবস্থায় জমি ফেরত নিতে হবে এবং অংশ হারে সবাইকে লিখে দিতে হবে। একজন লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম প্রদান করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি কি তোমার সব ছেলেকে অনুরূপ দিয়েছ? লোকটি বলল, না। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আল্লাহকে ভয় কর। তোমার ছেলেদের মাঝে ইনছাফ কর। তিনি বাড়ী ফিরে গিয়ে গোলামটি ফেরত নিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০১৯)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৯৩)ঃ কে কত খেতে পারে- এরকম প্রতিযোগিতা করা যাবে কি?

-ইয়াসীন
নবী নগর, বি-বাড়ীয়া।

উত্তর ঃ এরূপ করা জায়েয নয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা খাও এবং পান কর। তবে অতিরিক্ত খেয়ো না ও পান কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিরিক্ত করা পসন্দ করেন না' *(আ'রাফ ৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা খাও, পান কর, পরিধান কর এবং দান কর। তবে অতিরিক্ত কর না এবং অহংকারমূলক কর না' *(আহমাদ, ইবনে কাছীর হা/৩০৯৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আদম সন্তান যেসব পাত্র ভর্তি করে তার মধ্যে পেট সবচেয়ে মন্দ। আদম সন্তানের জন্য এই পরিমাণ কয়েক লোক্বমাই যথেষ্ট। যা দ্বারা সে নিজের কোমরকে সোজা রাখতে পারে। যদি এর অধিক খাওয়া প্রয়োজন মনে করে তবে এক তৃতীয়াংশ খাদ্য, আরেক তৃতীয়াংশ পানীয় এবং অপর তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে' *(ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৫১৯২, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৯৪)ঃ মসজিদ কমিটি বিবাহ উপলক্ষে বর পক্ষ হ'তে বাধ্যতামূলক ৩০০, ৫০০ কিংবা ১০০০, ২৫০০ টাকা নেয়। এভাবে টাকা নেওয়া কি বৈধ?

-সাবিরুদ্দীন
হাকীমপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মসজিদ কমিটি বাধ্যতামূলক টাকা নিতে পারে না। তবে স্বেচ্ছায় দিলে নেওয়া যাবে এবং দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারে। তবে মোহরানাকে হিসাব করে কোন টাকা নেওয়া যাবে না।

প্রশ্ন (৩৫/৩৯৫)ঃ আমি একটি গিটার ক্রয় করতে চাই এবং তাকে ভাল কাজে ব্যবহার করতে চাই। বৈধ হবে কি?

-মোশাররফ
উপশহর, রাজশাহী।

উত্তরঃ গিটার ক্রয় করা যাবে না। কারণ বাদ্যযন্ত্র কেনা ও ব্যবহার করা হারাম *(আবুদাঊদ হা/৪৯২৪; মিশকাত হা/৪৮১১)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৯৬)ঃ সোহেল রানা নামের শুদ্ধ আরবী-বাংলা উচ্চারণ এবং অর্থ জানতে চাই।

-সোহেল রানা
রাজশাহী।

উত্তর ঃ শব্দটি সোহেল নয় বরং সোহাইল سُــهَيْل অর্থ উজ্জ্বল তারকা বিশেষ। রানা শব্দটি রাজপুত হিন্দু রাজাদের উপাধি। এটি ইসলামী নাম নয়। তবে শুধু سُهَيْل নাম রাখা যায়।

প্রশ্ন (৩৭/৩৯৭)ঃ জনৈক মাওলানা জুম'আর খুৎবায় বলেন, আদম (আঃ) ৬০ হাত লম্বা ছিলেন এবং শরীরের প্রশস্ততা ছিল ৭ ফুট। এর সত্যতা জানতে চাই।

-বযলুর রশীদ
চৌরাস্তা, দিনাজপুর।

উত্তর ঃ আদম (আঃ) ৬০ হাত লম্বা ছিলেন মর্মে হাদীছ ছহীহ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬২৮)*। তবে তার শরীরের প্রশস্ততা ৭ ফুট ছিল এ মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (৩৮/৩৯৮)ঃ 'আক্বীদার মানদন্ডে তাবিজ' বইয়ের ৬২ পৃষ্ঠায় রয়েছে ছালাত ত্যাগকারীর প্রতি শরীয়তের বিধান? প্রথমতঃ তাকে কোন মুসলিম মহিলার সাথে বিবাহ দেয়া শুদ্ধ হবে না। ছালাত না পড়া অবস্থায় যদি তার আকদ বা বিবাহ সম্পাদন করা হয় তাহলেও তার বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। এই বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে উক্ত স্ত্রী স্বামীর জন্য হালাল হবে না। দ্বিতীয়তঃ বিবাহ বন্ধন সম্পাদন হওয়ার পর যদি সে ছালাত ত্যাগ করে তাহ'লেও তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। বিবাহ বাতিল হওয়ার ব্যাপারে স্ত্রী মিলনের আগে হউক বা পরে হউক এতে কোন পার্থক্য নেই। তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি ছালাত পড়ে না, তার জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে না। উক্ত জবেহকৃত পশু হারাম। যদি কোন ইহুদী অথবা নাসারা খৃষ্টান জবেহ করে তা আমাদের জন্য খাওয়া হালা। এ বিষয়ে দলীল ভিত্তিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাজমুল ইসলাম
গোবিন্দপুর, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাত ত্যাগকারী মুসলমান প্রকৃত অর্থে কাফির নয়। বরং মহাপাপী। কাজেই প্রশ্নে বর্ণিত হুকুম সমূহ তার উপর বর্তাবে না। এই ধরণের তরককারীগণ কলেমার বরকতে ও শেষনবী (ছাঃ)-এর শাফা'আতের ফলে শেষ পর্যায়ে জাহান্নাম থেকে জান্নাতে ফিরে আসবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/৫৫৭৩ শাফা'আত অধ্যায়; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১৭-২০)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯৯)ঃ সকলেই কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করেন। কিন্তু কা'বা ঘরের ভিতরে কেউ ছালাত আদায় করেছেন কি? যদি কেউ আদায় করে থাকেন তাহ'লে কোন দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করেছেন।

-দীদার বখশ
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সর্বপ্রথম কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন তখন ভিতরে ঢুকে ছালাত আদায় করেছিলেন কি-না এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উসামা, বেলাল ও ওছমান বিন তালহাকে নিয়ে কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন ও দরজা বন্ধ করে দেন। বেশ কিছু পরে বেরিয়ে আসার পর আমি বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল ভিতরে কি করলেন? বেলাল বলল, বামে একটি খাম্বা ও ডানে দু'টি খাম্বা রেখে রাসূল সেখানে ছালাত আদায় করলেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯১)*। ছাহেবে মির'আত বলেন, এই সময় পূর্বদিকের দরজ বরাবর পশ্চিম দেওয়ালের দিকে ফিরে তিনি (দু'রাক'আত) নফল ছালাত আদায় করেন' *(মির'আত ২/৩৯৬; আর-রাহীকুল মাখতূম ৪০৪ পৃঃ)*। মানছূরপুরী বলেন, এটি ছিল শুকরিয়ার ছালাত' *(রাহমাতুল লিল 'আলামীন ১/১১৯ পৃঃ)*। ছাহেবে মির'আত বলেন, এর দ্বারা কা'বা গৃহের ভিতরে নফল ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয় *(ঐ)*।

তবে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, সেখানে তিনি ছালাত আদায় করেননি। বরং বাইরে এসে কা'বামুখী হয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন এবং বলেন, এটিই কেবলা' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৮৯)*। এর জওয়াবে ইমাম নববী বলেন, বেলালের বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া ওয়াজিব। কেননা সেটি হাঁ সূচক এবং তিনি কা'বা গৃহের ভিতরে রাসূলের সঙ্গে থাকায় এ বিষয়ে অধিক অবগত ছিলেন'। ছাহেবে মির'আত বলেন, মুহাদ্দিছগণ বেলালের রেওয়ায়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে সকলে একমত। কেননা ঐ সময় বেলাল রাসূলের সাথে ছিলেন। কিন্তু ইবনু আব্বাস ছিলেন না' *(মির'আৎ ২/৩৯৪ পৃঃ, হা/৬৯৪-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। হ'তে পারে রাসূল (ছাঃ) বাইরে এসে পুনরায় দু'রাক'আত নফল পড়ে সকলকে কিবলা নির্দেশ করেন।

প্রশ্ন (৪০/৪০০)ঃ আহলেহাদীছদেরকে কটাক্ষ করে লাবু ঝাবু বলা হয় কেন?

-সোহেল রানা
তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তর ঃ শব্দটি লাবু ঝাবু নয় বরং শব্দটি হচ্ছে লা মাযহাবী- অর্থাৎ যারা নির্দিষ্টভাবে কোন একটি মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ করেন না। এটি আহলেহাদীছের বিরুদ্ধবাদীদের আক্রোশমূলক গালি মাত্র। আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) বলেন, বিদ'আতীদের কিছু নিদর্শন রয়েছে, যা দেখে তাদের চেনা যায়। বিদ'আতীদের লক্ষণ হ'ল, আহলেহাদীছদের গালি দেওয়া ও বিভিন্ন বাজে নামে তাদেরকে সম্বোধন করা। এগুলি সুন্নাতপন্থীদের বিরুদ্ধে তাদের দলীয় গোঁড়ামি ও অন্তর্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই একটি নাম ব্যতীত। সেটি হ'ল 'আহলুল হাদীছ'। বিদ'আতীদের এই সব গালি প্রকৃত অর্থে আহলেহাদীছদের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন মক্কার কাফেরদের জাদুকর, কবি, পাগল, মাথা খারাপ, গায়েবজান্তা প্রভৃতি গালি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য প্রযোজ্য ছিল না' *(গুনিয়াতুত ত্বালেবীন (মিসর : ১৩৪৬হিঃ), ১/৯০ পৃঃ; কি ও কেন? পৃঃ ১৬)*।